সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যং ?

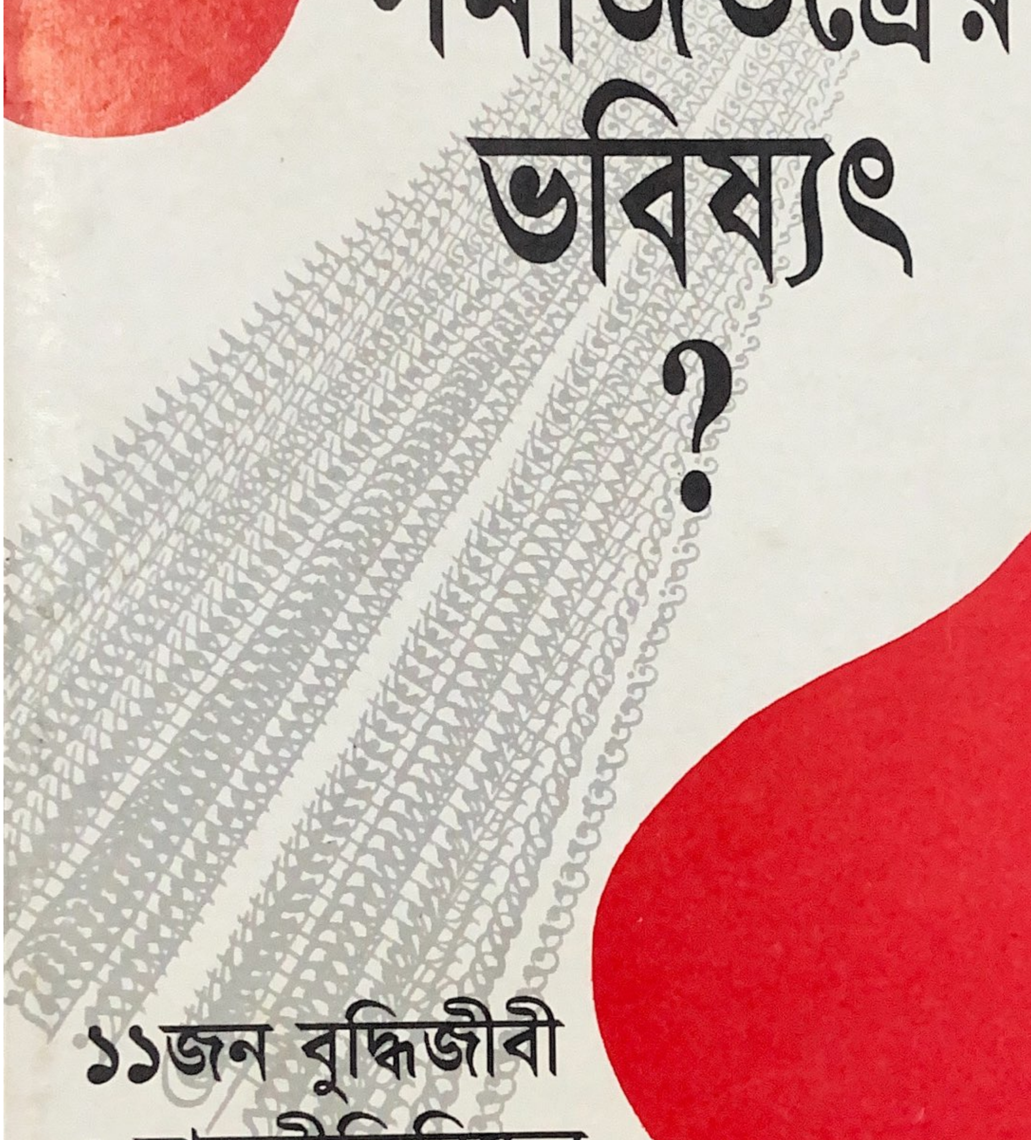

১১জন বুদ্ধিজীবী
ও রাজনীতিবিদের
মতামত

সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

?

১১জন বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদের
মতামত

মুখবন্ধ

পূর্ব ইউরোপ এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর সারা বিশ্ব জুড়ে সমাজতন্ত্রের ত্রুটি, বিচ্যুতি, ব্যর্থতা এবং ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে। আধুনিক প্রযুক্তি সজ্জিত শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম নানাভাবে সত্য, অর্ধসত্য, মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে, সমাজতন্ত্রের আদৌ কোন ভবিষ্যত নেই, সমাজতন্ত্র ছিল মানব ইতিহাসে এক দুর্ঘটনা, মানবজাতির জন্য এক দুঃস্বপ্ন মাত্র, এই কথাগুলিই প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার কথা বলে পুঁজিবাদের সঙ্কট, দ্বন্দ্ব, সংঘাত ধনবাদী দেশসমূহের জনগণের দারিদ্র্য, অনাহার, বেকারত্ব, দূর্দশা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে। বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের এই বিপর্যয় সমাজতন্ত্র, কমিউনিষ্ট শিবিরেও গভীর সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। প্রাক্তন কমিউনিস্ট যারা সমাজতন্ত্রের সমর্থনে এককালে সোচ্চার ছিলেন, যাদের মধ্যে বরং অতিভক্তিই দেখা গেছে– তাঁরা আজ অনেকেই মার্কসবাদ লেলিনবাদকে ভুল মনে করছেন, কমিউনিস্টদের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে বিষোদ্‌গার করছেন, ইতিহাসের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। অতীতের পন্ডশ্রমের জন্য অনুশোচনা করছেন এবং আধুনিক পুঁজিবাদ ও তথাকথিত মার্কেট ইকনমির ম্যাজিকের পক্ষে ওকালতি করছেন।

সমাজতন্ত্র ব্যর্থ, সাম্রাজ্যবাদের মানবিক ও গণতান্ত্রিক রূপান্তর হয়েছে, নানা কারণে বাংলাদেশে এই প্রচারটা বেশী শক্তিশালী। অথচ প্রতিবেশী ভারত, নেপাল, পাকিস্তান এমনকি খোদ ইউরোপ, আমেরিকায় এ ধরনের প্রচার হালে তেমন পানি পায় না। আমাদের দেশে পরিস্থিতিটা যে বেশী খারাপ তার একটি কারণ মনে হয় প্রাক্তন কমিউনিস্টরাই।

এই পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশে অনেকেই বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়, তীব্র প্রচারণা, চরম বিশ্বাসঘাতকতা, কটূক্তি, উপহাস, বাধা, বিপত্তি মোকাবেলা করে

সমাজতন্ত্রের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। সমাজতন্ত্রের পক্ষে পত্রিকায় লিখেছেন। সভা, সমাবেশ আলোচনায় অংশ নিয়েছেন।

বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের এই বিপর্যয়ের একটি ভাল দিকও আছে। মস্কোপন্থী অথবা পিকিংপন্থী হিসেবে নয় আগের চাইতে অনেক বেশী মুক্ত চিন্তা থেকে ঘটনাবলীর মূল্যায়ন, আত্মসমালোচনা, মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের তত্ত্ব ও বাস্তব প্রয়োগের বিভিন্ন দিকের উপর খোলামেলা আলোচনা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিশেষতঃ উন্নত বিশ্ব বলে পরিচিত দেশগুলিতে এসব নিয়ে খুবই সমৃদ্ধ আলোচনা হয়েছে। দুঃখের বিষয় যোগাযোগের অভাবে আমরা এগুলোর অধিকাংশ থেকেই বঞ্চিত হচ্ছি।

দেশের যেখানেই গিয়েছি সমাজতন্ত্রের সমর্থক অথবা রাজনীতি সচেতন মানুষ সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। প্রায় এক বছর ধরে চেষ্টা করছিলাম এধরনের একটি সংকলন আগ্রহী পাঠকদের হাতে তুলে ধরব। নানা কারণে অনেক বিলম্ব হয়ে গেল।

এ সম্পর্কে আরও ভাল লেখা অনেকে লিখেছেন। কিন্তু জায়গার অভাবে এবং সবগুলো সময় মত সংগ্রহ করতে না পারাতে ছাপা গেল না। এছাড়া বিভিন্ন মত দৃষ্টিভঙ্গী এখানে ধারণ করার চেষ্টা করেছি। যাদের লেখা ছাপা হল তাদের সবার সাথে যোগাযোগ করে অনুমতি নিতে পারিনি বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমার বিশ্বাস তারা আপত্তি তুলবেন না বরং খুশী হবেন।

এ বই প্রকাশে কমরেড, শাহীন, সামসুজ্জামান সেলিম, মোহাম্মদ মোতালেব, মুকুল, সিদ্দিক, সাইফুল, লতিফ প্রমুখ যে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন সে জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ।

মনজুরুল আহসান
৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩

সূচী

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রসঙ্গে	সরদার ফজলুল করিম	৯
মার্কসীয় তত্ত্বের নির্যাস	আহমদ শরীফ	১২
সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	১৫
সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘটনাবলী প্রয়োজন সত্যের অনুসন্ধান	রতন সেন	২৪
সোভিয়েত–সমাজতন্ত্রে ঘুণপোকার ভূমিকা	আহমদ রফিক	৩৩
সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ	বদরুদ্দীন উমর	৪৪
'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম'	যতীন সরকার	৫৫
আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সমাজতন্ত্র	হায়দার আকবর খান রনো	৬৩
সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত অক্টোবর বিপ্লব অমর হোক	মনজুরুল আহসান খান	৭১
কমিউনিজম শেষ, সাম্রাজ্যবাদ–পুজিবাদের এই রায় ইতিহাস প্রত্যাখান করবে	মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম	৭৭
বাহাত্তর দিনের পরে সত্তর বছর	আনু মুহাম্মদ	৮৪

সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ?
১১ জন বুদ্ধিজীবীর মতামত

প্রকাশক ঃ
মনজুরুল আহসান খান
উৎস প্রকাশনী
৩২/১ চামেলী বাগ
শান্তিনগর, ঢাকা–১২১৭

প্রকাশকাল ঃ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
হোম কম্পিউটার
৩২/১ চামেলী বাগ
শান্তিনগর, ঢাকা–১২১৭

মূল্য ঃ
বোর্ড বাঁধাই সাদা কাগজ – পঁয়তাল্লিশ টাকা
পেপার ব্যাক সাদা কাগজ – চল্লিশ টাকা
পেপার ব্যাক নিউজপ্রিন্ট – ত্রিশ টাকা

প্রচ্ছদ ঃ
শফিকুল কবীর চন্‌দন

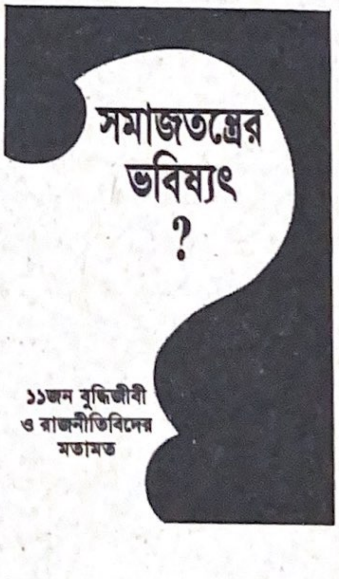

সমাজতন্ত্রের
ভবিষ্যৎ
?

১১জন বুদ্ধিজীবী
ও রাজনীতিবিদের
মতামত

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রসঙ্গে

সরদার ফজলুল করিম

"সমাজতন্ত্র ঃ সমাজভুক্ত সকল ব্যক্তির হিতার্থে (ভূমি ও কলকারখানা প্রভৃতি) উৎপাদকের সহায়ক সমস্ত কিছুই রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিতঃ এই মতবাদমূলক শাসনব্যবস্থা, Socialism" (সংসদ বাঙলা অভিধান)

যার কোন বিকল্প নেই, সে কারুর কাছে ভাল কিংবা মন্দ যা বলেই বিবেচিত হোক না কেন, তাকে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা অহেতুক পরিশ্রমেরই ব্যয়। এর অপর কোন সার্থকতা নেই।

অবশ্য অনিবার্যকে নিবারণ করার চেষ্টা করে তারা, যারা সেই অনিবার্যের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বকে বিপন্ন দেখে। যারা সেই অনিবার্যকে নিজেদের জীবনের ও সংগ্রামের পরিণাম হিসেবে দেখে তারা তাকে নিবারণের চাইতে স্বাগত জানাতে চায়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই হেগোলের এরূপ উক্তিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করা যায় যে, "বুদ্ধিমানরা ইতিহাসের সঙ্গে যায়, নির্বোধকে ইতিহাস টেনে নেয়।"

সমাজতন্ত্র কাকে বলে?

নানান জনের নানান ব্যাখ্যা। কিন্তু ব্যাখ্যার পূর্বে মূল কে মানতে হবে। সমাজই মূল। সমাজ থেকে সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্রের নানা ব্যাখ্যা হতে পারে এবং হবে ঃ রাষ্ট্রীয়করণ, বিরাষ্ট্রকরণ, যৌথকরণ, ব্যক্তিগত মালিকানা ঃ তার পরিমাণ ও সীমা, নিয়ন্ত্রণহীন বাজার, নিয়ন্ত্রিত বাজার ইত্যাদি। দেশ ও কাল নির্বিশেষে এর কোন অপরিবর্তনীয় সংজ্ঞা বা ধার্যকৃত চরিত্র থাকতে পারে না। কিন্তু কাল থেকে কালে আর দেশ থেকে দেশে এই সব সমস্যা ও তার বিভিন্ন সমাধান প্রচেষ্টা 'সমাজতন্ত্রের' অনিবার্যতাকে নাকচ করতে পারেনা।

প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত এ্যারিস্টটল বলেছেন "মানুষের রাষ্ট্রের আসল বৈশিষ্ট্য হচেছ এই যে, মানুষের রাষ্ট্র হচ্ছে মানুষের সমবায়ে সংগঠিত একটি সংস্থা।"

এই সমবায় ব্যবস্থা চার হাজার বছর পূর্বে কিরূপ ছিল তার গবেষণা মার্কস–এঙ্গেলসও শেষ করেননি। তাঁরা বলেছেন "মানুষের ইতিহাস যতটুকু আমরা জেনেছি,

'তার লিখিত ইতিহাস' তাতে অনুমান করি 'আদিতে' মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবেই সমবায়গত জীবন যাপন করতে হয়েছে। সেটা কোন আদর্শ অবস্থা নয়। তা ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু মূল যেটা তথা মানুষের সমাজ, তার ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণে সমবায়ী হওয়ার লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায়ন্তর নেই।"

এবং সে কারণেই তাঁরা বলেছেন, মানুষের শেষহীন অভিযাত্রায় মানুষকে ক্রমাধিক পরিমাণে সমবায়ী সমাজ তৈরী করতে হবে। এই স্বপ্ন মানুষকে দেখতে হবে। এই স্বপ্নই তার চালকশক্তি। এই অভিযাত্রায় তার হাজার উঠতি-পড়তি অগ্রগমন-পশ্চাৎ হটা ঘটবে। তবু মানুষ এগিয়ে যাবে।

সাম্যবাদের দৃষ্টান্তের জন্য আমাদের দূর ভবিষ্যতের অপেক্ষা করতে হয় না। প্রত্যেকটি পরিবারই সাম্যবাদী নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত পরিবার। ছোট-বড়-মা-বাবা-ভাই-বোন, অক্ষম-সক্ষম সকলকে নিয়ে যে পরিবার সে পরিবারের নীতি হচ্ছে ঃ from each according to his capacity, to each according to his necessity: প্রত্যকের নিকট থেকে তার ক্ষমতা মতো গ্রহণ এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজনমতোপ্রদান।

মার্কস এঙ্গেলস স্বপ্ন দেখেছিলেন ঃ পারিবারিক এই সাম্যবাদী নীতি একদিন সমগ্র মানবসমাজে পরিব্যপ্ত হয়ে পড়বে। সমগ্র মানবসমাজই একটি পরিবারে পরিণত হবে যে মনুষ্য-পরিবারের পরিচালনার স্বাভাবিক নীতি হবেঃ প্রত্যেকের নিকট থেকে তার ক্ষমতানুযায়ী এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী।

আজ পরিবারের মধ্যে যে নীতি সার্বজনীনভাবে স্বাভাবিক বলে গৃহীত কিন্তু মনুষ্য সমাজের বিকাশের অসম্পূর্ণতার কারণে যে-নীতি অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত, সে নীতি মনুষ্য সমাজের সম্পদ ও শক্তির বিপুল বিকাশে সেদিন পরিবারের ন্যায়ই সার্বজনীনভাবে স্বাভাবিক বলে গৃহীত হবে।

এর চাইতে মহৎ স্বপ্ন আর কি হতে পারে? মার্কস এঙ্গেলস আমাদের এই স্বপ্নের যুক্তিকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ করেছেন। মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর নিকট আমরা তাইঋণী।

মানুষের ভবিষ্যতের সেইদিন কবে? মার্কস যদি সেদিন সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন, আর সে ভবিষ্যদ্বাণী যদি বাস্তবে সত্য না হয়েও থাকে, তবুও মনুষ্য সমাজের সামনে যে স্বপ্নকে তাঁরা তুলে ধরেছেন, সে স্বপ্নের মৃত্যু নেই।

স্বপ্নের সেই দিন কবে? আমি বলব 'ত্রিশ হাজার বছর' পরে মানুষের জীবনে সেই দিন প্রায় আসন্ন হয়ে আসবে যে-দিন মানুষের সমাজ অদ্যকার চাইতে অধিকতরভাবে বুঝতে সক্ষম হবে যে, সাম্যবাদের কোন বিকল্প নেই। আদিম সাম্যবাদ যদি প্রাকৃতিকভাবে অচেতন এবং বাধ্যতামূলক ছিল তো ভবিষ্যতের সাম্যবাদ হবে মানুষের যৌথ এবং সচেতন স্বেচ্ছামূলক জীবনাচরণেরই প্রকাশ।

এ হচ্ছে দূরের কথা। দূর–দৃষ্টির কথা। নিকটে অবশ্য অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক ব্যাখ্যা, অনেক রাশিয়ার পতন–উত্থান, অনেক রিগান বুশের যাওয়া এবং আসা, অনেক হাঁ ও না। জোয়ার এবং ভাটা। এই দ্বন্দ্ব, উথান ও পতন, হ্যাঁ ও না–র বৈচিত্র্যও সমাজের দ্বন্দ্বমূলক রূপান্তরের তত্ত্বের সত্যতারই সাক্ষ্যবহন করে, শূন্যতার নয়।

সমাজের দ্বন্দ্বমূলক রূপান্তরের তত্ত্বকে যারা আজ মিথ্যা বলে নাকচ করার চেষ্টা করছে তারা তাদের সেই চেষ্টার মধ্যমেই দ্বন্দ্বমূলক রূপান্তরের তত্ত্বকে সত্য বলে প্রমাণিত করছে। মার্কসবাদ বলে যদি কিছু থাকে তবে মার্কসবাদের বিরুদ্ধতাও মার্কসবাদের অঙ্গীভূত। পক্ষ–বিপক্ষের মধ্যদিয়েই মার্কসবাদ বিকশিত হয়ে এসেছে।

মার্কসবাদের পক্ষ–বিপক্ষের দ্বন্দ্ব বর্তমানে যেরূপ দেশে দেশে ব্যাপ্ত ও বিস্তারিত, ইতিহাসে এমনটি আর কখনো হয়নি। সেদিক থেকে বর্তমানের বিশ্বব্যাপী এই তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব মার্কসবাদের সবলতারই পরিচায়ক। দুর্বলতার নয়।

আজকের পৃথিবী ক্ষুদ্র বটে। আবার বিচিত্ররূপে বৃহৎও বটে। রাশিয়ার ব্যাপার যেমন রাশিয়ার ব্যাপার, তেমনি আমাদেরও ব্যাপার। আমেরিকার ব্যাপার যেমন আমেরিকার ব্যাপার, তেমনি আমাদেরও ব্যাপার। এবং বাংলাদেশের ব্যাপার যেমন বাংলাদেশের তেমনি পৃথিবীরও। আবার এও সত্য যে, রাশিয়ার ব্যাপার আমাদের ব্যাপার হলেও, রাশিয়ার কোন সরকার বা ব্যবস্থা ডুবলে বা আদর্শগত ভাবে ব্যর্থ হলে আমাদেরও ডুবতে হবে কিংবা আদর্শগতভাবে ব্যর্থ হলে প্রমাণিত হতে হবে, এমন কোন স্বতঃসিদ্ধ কথা নেই।

স্ট্যালিন ব্যক্তি হিসেবে ভাল কি মন্দ, হৃদয়হীন কিংবা হৃদয়বান, ইতিহাসের সামগ্রিক বিচারে সেটি বড় কথা নয়। মানুষ মাত্রই 'হ্যাঁ' এবং 'না' দিয়ে তৈরী। যারা মৃত স্ট্যালিনকে এক কবর থেকে তুলে আর এক কবরে সমাধিস্থ করাকেই তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড, চিন্তাভাবনার একমাত্র নিয়ামক করে তোলে, তারাই স্ট্যালিনকে অতিমানুষে পর্যবসিত করে। তাঁর শক্তিকে অনস্বীকার্য করে তোলে। লেনিনের গলায় যারা দড়ি লাগিয়ে টানে তারাও লেনিনের শক্তিকে স্বীকারই করে। অস্বীকার নয়। টেলিভিশনের ছবিটি আমি বিপরীত–ভাবে দেখেছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, লেনিন তার ধ্বংসকারীর গলায় দড়ি লাগিয়ে টানছে। রাশিয়ার সাম্প্রতিক বিস্ফোরণের বর্বরতাকে যারা 'জনতার' রোষ বলে আখ্যায়িত করছে, তারা একথা বিস্মৃত হয় যে, মহতের বিরুদ্ধে বর্বরের র্বরতা মহতের মহত্ব এবং বৃহত্বকে হ্রস্ব করতে পারে না। নিজের হ্রস্বতাই কেবল সে প্রকট করতে পারে। তাই লেনিনকে যারা টেনে নামায় তাদের মুখে জ্ঞানের কোন কথা কিংবা মনুষ্য জীবনের মহৎ ভবিষ্যতের কোন কথা উচ্চারিত হয় না। এটাই স্বাভাবিক। [১৮–৯–৯১]

মার্কসীয় তত্ত্বের নির্যাস

আহমদ শরীফ

দুঃস্থ নিরন্ন মানুষের প্রতি কিছু মানুষের দরদ ও সহানুভূতি চিরকালই ছিল। এমনকি দাসযুগেও সব প্রভু নিষ্ঠুর ছিল না। কোন কোন মানুষের স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা আদর আবেগ কিছু অধিক থাকে। তাদের এ দরদী মনের পরিচয় মেলে তারা কুকুর–বিড়াল–পাখি পোষে, কোলে–পিঠে নিয়ে আদর করে, গৃহপালিত গরু–ছাগল–ভেড়াকে, হাঁস–মোরগকেও এমনি সস্নেহ আদর করে কোন কোন গৃহস্থ। প্রায় সন্তানের মতোই যত্নও করে। আশ্চর্য তেমন ব্যক্তিও স্ব–প্রজাতির মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর হয়। পশু–পাখির প্রতি পরম মমতায় যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য বরণ করে লালন–পালনের, সেই মানুষও মানুষের স্পর্শে তার দেহ–মন অপবিত্র হয় বলে মনে করে, মানুষকে গায়ের রঙ–রূপের মাপে, কালো–ধলোর অসাম্যে–বৈষম্যে গুরুত্ব দেয়।

নিরন্ন ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতি সংবেদনশীল ব্যক্তির দরদ কৃপা–করুণা–দান–দাক্ষিণ্য রূপে অভিব্যক্তি পায়। হাজার হাজার বছর ধরে নবী–অবতার–সাধু–সন্ত প্রভৃতি সমাজ সংগঠন নানা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সূত্রে তাঁদের বাণী ও লেখনীর মাধ্যমে নিরন্ন–নিঃস্বকে অন্ন বস্ত্র দানে লালনের–পালনের–পোষণের কথা বলে গেছেন। তাই দরিদ্রকে নারায়ণরূপেও কোন কোন দরদী মানুষ অভিহিত করে তার প্রতি ধনীর দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ কেবল মানুষ নয়, জগতে সব জীবের ক্ষুদ্র কীট–পতঙ্গ–মশা–মাছি থেকে হাতী–তিমি অবধি সব প্রাণীরই বাঁচার এবং পৃথিবীতে সহাবস্থানের অধিকার স্বীকার করেছেন এবং অনুগত ভক্তদের করিয়েছেন আড়াই হাজার বছর আগেই। তবু অন্য প্রাণীর চেয়ে মানুষের প্রতিই মানুষের ঘৃণা–অবজ্ঞা–হিংসা–ঈর্ষা বেশি নানা কারণে। মানুষের সমাজেও চিরকাল জঙ্গল জীবন সুলভ কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানি লঘু–গুরুভাবে চলে আসছে। উদ্ভিদভোজী নয়, তেমন বিভিন্ন জীবের মধ্যে রয়েছে খাদ্য–খাদক সম্পর্ক। মানুষ হচ্ছে সর্বভুক। তার লিপ্সার, তার ভোগ–উপভোগ–সম্ভোগ বাঞ্ছার কোন সীমাশেষ নেই। তার ছল–চাতুরী–কৌশল–ধূর্ততাও অশেষ। তাই তাকে আদেশ–নির্দেশের উপদেশ পাপের শাস্তির ও নিন্দার ভয় দেখিয়েও শায়েস্তা রাখা যায়নি, যায় না। এভাবেই ভূত–

ভগবানের শাস্ত্রের ও নৈতিকতার দোহাই ব্যর্থ হয়েছে মানুষের সামাজিক তথা যৌথ জীবনে। আজো বৃথা ও ব্যর্থ প্রমাণিত হচ্ছে। যদিও হাজার হাজার বছর আগে থেকেই তাদের নানা অলীক অলৌকিক ভয় ও লৌকিক সামাজিক কারণ দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে দেশে দেশে কালে কালে, গোত্রিক-গোষ্ঠীকে সাম্প্রদায়িক জীবনে দ্বেষ দ্বন্দ্বে নয়, সংযমে-সহিষ্ণুতায়-সহযোগিতায় সৌজন্যেই শান্তিতে-স্বস্তিতে সুখে নির্বিরোধে-নির্বিঘ্নে-নিরুপদ্রবে-নিরাপদে সহাবস্থান সম্ভব। বারবার গুণী জ্ঞানী মানবহিতৈষী শান্তিকামী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা দেশে-দেশে, কালে-কালে স্ব-সমাজের স্বজনদের বলেছেন, ভালো হও, অপরের ভালো চাও, অন্যের ভাল কর, মানুষকে ক্ষমা করতে শেখো, লোভ করো না, মানুষকে ভালোবাস।

বর্ধমান, মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধের আগে কেউ সর্বজীবের বেঁচে থাকার, পৃথিবীতে অন্য প্রাণীদের সঙ্গে সহাবস্থানে নিরাপদে জীবনযাপনের জন্মগত অধিকারের কথা উচ্চারণ করেন নি। যদিও আগেই বলেছি দরদী মানুষের স্বল্পসংখ্যায় হলেও কোথাও কখনো অভাব বা অনুপস্থিতি ছিল না। ষোল শতকে ইউটোপিয়ান টমাস মুরকে এবং আরো কয়েকজন ইউটোপিয়ান মানববাদীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলা চলে উনিশ শতকে কার্ল মার্কসই প্রথম নির্বিশেষে মানুষের আধা-কানা-খোঁড়া-পঙ্গু-রুগ্ন-অনাথ-অসহায় নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধার খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার সযুক্তি স্বীকার ও প্রচার করলেন এবং বাস্তবায়নের পন্থাও বাতলালেন। তিনি যে পন্থা নির্দেশ করলেন, তা হল 'Maximum বা greatest goods to the majority' নীতি যা তত্ত্বভিত্তিক। তিনিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে মনুষ্য সমাজে সর্বত্র দৃশ্যে ও অদৃশ্যে রয়েছে শ্রেণী বিভক্তি। শোষকের ও শোষিতের শ্রেণী। অবচেতনভাবেই চলছে কাড়াকাড়ি। এ শ্রেণী-দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী-লড়াই। বাহুবলে, বুদ্ধিবলে, ধনে জনে প্রবল ব্যক্তিরাই শোষণ করেছে ক্ষীণ প্রাণ, স্বল্প বুদ্ধি, ভীরু, সকল দুঃস্থ, নিরন্ন, নিঃসম্পদ, দুর্বল, অসহায় মানুষদের।

মার্কস-এঙ্গেলসের নির্দেশিত তত্ত্বে ও পন্থায় প্রায়োগিক হেরফের যুক্ত লেনিন-মাও রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে মানুষের বাঁচার জন্মগত অধিকারকে বাস্তব রূপ দিলেন। অতি সরল করে মার্কসবাদের নির্যাস বয়ান করা চলে। আমরা এখানে তাই বয়ান করছি। মা-বাপের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সন্তানদের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করা। যদি এমন হয় যে মা-বাবার ছয়টি সন্তানের মধ্যে তিনটি নিখুঁত অবয়বের পুত্র হল আর দু'টি পুত্রের একটি অন্ধ, অন্যটি হল পঙ্গু, আর ষষ্ঠটি হল মেয়ে। মা-বাপের এখন দায়িত্ব হল তিনটে পূর্ণাঙ্গ সন্তানকে যে কোন কাজের যোগ্য করে কাজ ধরিয়ে বা পাইয়ে দেয়া, অন্ধ ও পঙ্গু সন্তানদের বসিয়ে খাওয়ানো এবং মেয়েকে পাত্রস্থ করা। সন্তানদের যেমন মা-বাবার উপর এ জন্মগত অধিকার ও দাবি, মা-বাবারও তেমনি দায়িত্ব ও কর্তব্য এড়ানোর কোন উপায় নেই।

আধুনিক রাষ্ট্রের বা সরকারের দায়িত্বও হচ্ছে যোগ্যতানুসারে রাষ্ট্রবাসী সমর্থ নারী-পুরুষ মাত্রকেই জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করে দেয়া। জীবিকার্জনের জন্যে কাজ পাওয়ায়

রয়েছে সমর্থ নাগরিকের জন্মগত অধিকার। সে সঙ্গে রয়েছে তার নিম্নতম প্রয়োজনানুযায়ী অশন–বসন–নিবাস–নিদান–চিকিৎসা–স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে সরকারী দায়িত্ব ও কর্তব্যের স্বীকৃতি আদায়ের। আর যারা অনাথ শিশু, রুগ্ন, অন্ধ, পঙ্গু, বৃদ্ধ–বৃদ্ধা তাদেরও রয়েছে সরকারী বৃত্তিজীবী হয়ে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার। মানুষকে কত গভীরভাবে ভালোবাসলে, কত বড় মানবদরদী হলে, মনুষ্যত্ব বা মানবতা কত উঁচুমানের মাপের ও মাত্রার বিকাশ পেলে ব্যক্তির মেধা মনীষা মানুষকে খাইয়ে–পরিয়ে–বাঁচিয়ে রাখার এ চিন্তন–মনন–মনীষা–মগজ–অনুশীলনে সম্ভব হয়, তা ভাবা যাদের পক্ষে সম্ভব কেবল তারাই কার্ল মার্কসের মনুষ্যত্বের ও মনীষার মূল্য–মর্যাদা, বিস্তার–বিকাশ–উৎকর্ষ অনুভব–উপলব্ধি করতে পারে।

আজ পুঁজিবাদীদের চক্রান্ত ও প্ররোচনায় এ–প্রজন্মের রাশিয়া–চীনের লোকেরা যথাক্রমে সত্তর বছর আগেকার জারশাসিত রুশ সাম্রাজ্যের মানুষের নিঃস্বতা, নিরন্নতা, ভূমিদাসত্ব–অনাহার–অপুষ্টিজাত যন্ত্রণাময় জীবনের অকালে অবসানের ইতিবৃত্ত ভুলে গেছে। তাই এ হুজুগে দ্রোহিতায় অচিরেই আত্মহননের পথে এগুতে তাদের এত উৎসাহ। আমাদের বিশ্বাস অচিরেই তারা উপলব্ধি করবে, অনেক কিছু হারিয়ে অনেক জ্বালা–যন্ত্রণায় ভুগে তারা যে পথ বেছে নিয়েছে সোৎসাহে তা অতি পুরনো–সেই শাহ–সামন্ত–বেনে–বুর্জোয়া পন্থা–যাতে রয়েছে যোগ্যতমের উর্ধ্বতন তত্ত্ব, যেখানে জোর যার মুলুক তার, যেখানে শিষ্টের দমন ও দলন আর দুষ্টের লালন–পোষণই রীতি, যে আর্থ–সামাজিক নীতি–নিয়মে, রীতি–রেওয়াজে, প্রথা পদ্ধতিতে থাকে ভিখিরী, চোর–ডাকাত–রাহাজানি, চোরাচালানী, আড়তদারী, মজুতদারী, মুনাফাখোরী, ঘুষ, দালালী, কমিশন, বখশিস–পাওন, নজর, উপঢৌকন প্রভৃতি নামে সর্বপ্রকার লুটপাটমূলক দুর্নীতি। শ্রেণীদ্বন্দ্ব, শোষক–শোষিত সম্বন্ধই যে সমাজের বৈশিষ্ট্য। আজ দুনিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিবাদী মার্কিন সরকার নানাভাবে ষড়যন্ত্রপটু বুশের নেতৃত্বে সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আগ্রাসন নীতি চালু করেছেন সমাজবাদী–কম্যুনিস্ট বিনাশের সংকল্প নিয়ে। কিন্তু আমরা জানি মার্কসবাদের বিকল্প কিংবা তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন পন্থা পদ্ধতি উদ্ভাবিত না হলে, মার্কসবাদই মানবমুক্তির শোষণমুক্তির, মানবতার, মনুষ্যত্বের মানুষের বাঁচার এবং মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার অবিকল্প উপায় বলেই সর্বপ্রকার শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিলুপ্তি সনদরূপে আমরা জানব, বুঝব এবং মানবো। মার্কসবাদ জিন্দাবাদ। অক্টোবর বিপ্লব আমাদের প্রেরণার, প্রণোদনার, প্রর্বতনার এবং মানবতাবাদ প্রচারের অবলম্বন থাকুক। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিড়াল'– এর একটা উক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি ঃ

'ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়। পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার সংগ্রহ করিবে কেন? অতিরিক্ত অংশ তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে, কেননা অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।”

সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

১.

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতন অনেককেই বিস্মিত করেছে, যথার্থ সমাজতন্ত্রীদেরকে ছাড়া। বিশেষভাবে বিস্মিত হয়েছে পুঁজিবাদী ও মস্কোপন্থীরা। দু'পক্ষের প্রতিক্রিয়া অবশ্য দুই রকমের, বিস্মিত পুঁজিবাদীরা উৎফুল্ল; বিস্মিত মস্কোপন্থীরা বিষণ্ন। পুঁজিবাদীরা মনে করছে শয়তানের কারখানাটা শেষ হলো, মস্কোপন্থীরা ভাবছে স্বর্গ ভেঙ্গে পড়লো। বলাবাহুল্য, উভয় ধারণাই ভ্রান্ত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্যই শয়তানের কারখানা ছিল না, যেমন ছিল না কোন স্বর্গভূমি। অপরদিকে যথার্থ সমাজতন্ত্রীরা বিস্মিত হননি, তাঁরা ঘটনার গতি লক্ষ্য করছিলেন এবং এমন একটা কিছু ঘটবে বলে তাদের মধ্যে উদ্বেগ ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের পতন দেখে মার্কস–এঙ্গেলস বিস্মিত হতেন না, যেমন হতেন না লেনিন ও মাও সে তুং। তারা দেখতেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ওই রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক বিকাশকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল সেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, বরঞ্চ ক্রুশ্চেভের পর থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে ঠেলে দিচ্ছিল। ফলে যা ঘটার তাই ঘটেছে; ভেঙে পড়েছে।

২.

মার্কস নিজে মার্কসবাদী ছিলেন না, কিন্তু মার্কসবাদের ভিত্তি তিনিই রচনা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। মার্কসবাদকে সৃষ্টিশীল উপায়ে বাস্তব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে লেনিন ১৯১৭–র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন।

কিন্তু মার্কস বা লেনিন কেউই মনে করতেন না যে, সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলই বিপ্লবের শেষ। তারা মনে করতেন ক্ষমতা দখল বিপ্লবের সূচনা মাত্র। শ্রমিক শ্রেণী পূর্বনির্মিত রাষ্ট্রযন্ত্রকে দখল করেই তাকে নিজের কাজে লাগাতে পারবে এ বিশ্বাস মার্কস–এঙ্গেলসের ছিল না। তারা মনে করতেন রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণী–নির্যাতনের হাতিয়ার। সমাজতন্ত্রীদের তাই কাজ হবে পুরাতন রাষ্ট্র ভেঙে ক্রমশ এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে রাষ্ট্রের আর প্রয়োজনই না থাকে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী–বিভাজনের অবসান ঘটবে, কাজেই রাষ্ট্র এক সময়ে উঠে যাবে– এ ছিল আশা। সোভিয়েত

ইউনিয়নে সেটা ঘটেনি। বরঞ্চ রাষ্ট্র ক্রমাগত শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। যাতে প্রমাণ হয় শ্রেণী–বিভাজন শেষ হয়নি, রয়েই গেছে।

গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা করতে গিয়ে মার্কস বলেছেন যে, সাম্যবাদী সমাজের উদ্ভব পুঁজিবাদী সমাজ থেকেই ঘটবে। তাই নতুন সমাজের অর্থনৈতিক,নৈতিক ও মানবিক প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরানো সমাজ থেকে তার জন্মের চিহ্নগুলো রয়ে যাবে। অব্যাহত শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কেবল সম্ভব হবে এই চিহ্নগুলো মুছে ফেলা। লেনিনও অবিকল তাই ভাবতেন। বিপ্লবের আগে যেমন, পরেও তেমনি, লেনিন বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উৎখাত হবার পরেও, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ধ্বংসের পরেও, সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পরও শ্রেণী সংগ্রাম বিলুপ্ত হয় না। বুর্জোয়া শ্রেণী পরাজিত হলেও তাদের স্বর্গ ফেরত পাবার স্বপ্নটা ছাড়ে না। এবং যতভাবে পারা যায় প্রতিরোধ ও অন্তর্ঘাতের সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে থাকে স্বতঃস্ফূর্ত পেটি বুর্জোয়া উৎপাদন ইউনিট। দেশীয় বুর্জোয়াদের আদর্শ শ্রমিক শ্রেণীর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট থাকে; এবং বাইরের পুঁজিবাদ অস্ত্র নিয়ে তো বটেই, আদর্শ নিয়েও আক্রমণ করতে চায়। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক সমাজেও শ্রমিক ও কৃষক, শহর ও গ্রাম, দৈহিক ও মানসিক শ্রম–ইত্যকার বিভাজনগুলো থেকে যায়। লেনিন তাই মনে করতেন যে, পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ একদিনের ব্যাপার নয়, সেটি একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া, যার প্রতিটি পর্যায়েই শোষক শ্রেণীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে প্রতিহত করার আবশ্যকতা থাকবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মার্কস ও লেনিনকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক। যেমন, পুরানো সমাজতন্ত্রীদের বলা হয় কল্পনাবিলাসী।

১৮৭১–এ প্যারী কমিউনের অভ্যুথানের মধ্যে মার্কস দেখেছিলেন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মেহনতি মানুষের একটি স্পষ্ট সাহসী ঘোষণা; ওই অভ্যুথানের যখন পতন হলো তখন মার্কস নৈরাজ্যবাদীদের মতো বলেননি যে, স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুথান চালিয়ে যেতে হবে। তিনি বরঞ্চ দেখলেন ও বললেন যে, মেহনতীদের পক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার জন্য প্রয়োজন হবে নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন। লেনিন এই সংগঠনই গড়ে তুলেছিলেন। সংগঠনের নেতৃত্বেই বিপ্লব হয়েছে, কিন্তু বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে লেনিন সতর্ক হলেন পেছনে একটি নতুন বিপদ সম্পর্কে। সেটি হচ্ছে আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্রকে ভাঙার জন্যই লেনিন বলেছিলেন যে, সব ক্ষমতা দিয়ে দিতে হবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের (সোভিয়েত) হাতে। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে পার্টির হাতে এবং পুরাতন আমলাতন্ত্রের জায়গায় দেখা দিয়েছে নতুন আমলাতন্ত্র। সেটি পার্টির। এই আমলাতন্ত্র ক্রমশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং সেই কারণে অন্য যে কোন আমলাতন্ত্রের চেয়ে অধিক ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। লেনিন চেয়েছিলেন, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, কিন্তু তার পার্টিতে কার্যত কেন্দ্রিকতাই রইল, গণতন্ত্র উঠে গেলো। পার্টি হয়ে দাঁড়ালো কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কমিটি পরিণত হলো

সাধারণ সম্পাদকের শাসনে। স্ট্যালিনের সময়ই এর সূত্রপাত; ক্রুশ্চেব-ব্রেজনেভ-গরবাচেভ ওই আমলতান্ত্রিক বিচ্যুতিরই ধারাবাহিক পরিণতি।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে লেনিন বিশ্বাস করতেন সারা পৃথিবীর নিপীড়িত শ্রেণী ও জাতিসমূহের ঐক্য। সোভিয়েত ইউনিয়নেই পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে,এটা ঠিক, কিন্তু এই বিপ্লব অর্থহীন হবে, নিতান্তই এক ধাপ্পাবাজীতে পরিণত হবে, যদি না তা পুঁজির হাতে নিপীড়িত কোটি কোটি 'ঔপনিবেশিক' ক্রীতদাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও পরিপূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে- লেনিন এই রকমই মনে করতেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের যে লড়াই সেটি দেশীয় নয়, আন্তর্জাতিক; সে - লড়াইয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্য দেশের সমাজতন্ত্রীদের পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের কারণে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ব্যাপারটা রাষ্ট্রীয় সাহায্যের নয়, আদর্শগত ঐক্যের। তিনি বলেছেন, "একটিই হোক আর সব ক'টিই হোক- সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে অগ্রগামী দেশ।"

"বিপ্লবীদের এবং সমস্ত শোষিত জনগণের সঙ্গে মৈত্রী হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর বৈদেশিক নীতি।" লেনিন খুব স্পষ্টভাবেই জানতেন, জাতিগত নিপীড়নই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের মর্মবস্তু। বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ যতদিন থাকবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইও ততদিনই চলবে। লেনিনের এই প্রত্যয়ে কোন অস্পষ্টতা ছিল না।

৩.

স্ট্যালিনের অনেক সমালোচক রয়েছে। স্ট্যালিন যে অভ্রান্ত ছিলেন তা অবশ্যই নয়। মাও সে তুঙ দেখিয়েছেন যে, স্ট্যালিনের দেশীয় ও বৈদেশিক উভয় নীতিতেই ত্রুটি ছিল। যেমন, কৃষিতে যৌথকরণ সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ট্যালিন মনে করেছিলেন যে, সোভিয়েত বৈরী শ্রেণীগুলো আর নেই, শ্রেণী সংগ্রামেরও অবসান ঘটেছে। কিন্তু বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া আদর্শ ও অবশেষগুলো ঠিকই ছিল। ওদিকে রাষ্ট্র তাঁর সময়েই ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে ওঠে, লোপ পাওয়ার পরিবর্তে তা ভয়াবহ রূপ নিতে থাকে।

মাও সে তুঙ এও দেখিয়েছেন যে, পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশঙ্কাকে স্ট্যালিন আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সশস্ত্র আক্রমণের বিষয় হিসেবেই প্রধানত দেখেছেন। এই দেখাতেও ভ্রান্তি ছিল, এবং এই লাইন ধরেই পরে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত সিআইএ ও কেজিবি'র দ্বন্দ্ব এবং সমরাস্ত্র প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছিল, আদর্শগত সংগ্রামকে গৌণ করে দিয়ে।

কিন্তু তবু স্ট্যালিনও কখনই মনে করেন নি যে, এক দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেই লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে। স্ট্যালিনের দুর্বলতাগুলোকে যে পরিস্থিতিতে তাকে কাজ করতে হয়েছে তার পটভূমিতে স্থাপন করেই বিচার করতেহবে। হিটলার তো বটেই, আসলে সমগ্র পুঁজিবাদী বিশ্বই প্রাণপণে চেষ্টা করছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে

নিশ্চিহ্ন করে দেবার। তাদের চরেরা ভেতর থেকে অন্তর্ঘাত চালিয়ে যাচ্ছিল। সে অবস্থায় কিছুটা আত্মমুখিতা (আন্তর্জাতিকতার বিপরীতে) ও আমলাতান্ত্রিকতা (স্বতঃস্ফূর্ততার জায়গায়) অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু স্ট্যালিনও লেনিনের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিপ্লবের ঘাঁটি হিসেবে দেখেছেন তথাকথিত 'পিতৃভূমি' মনে করেন নি। লেনিনের মতোই তিনিও মনে করতেন যে, একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের জয়লাভ শেষ লক্ষ্য নয়, বরঞ্চ তা হচ্ছে অন্যান্য দেশে বিপ্লব বিকাশের ও সমর্থনের একটি উপলক্ষ মাত্র। তিনি বলেছেন, যে বিপ্লব একটি দেশে জয়ী হয়েছে সে বিপ্লব যেন কিছুতেই নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে না করে, নিজেকে যেন সে সব দেশের সর্বহারা শ্রেণীকে ত্বরান্বিত করার সাহায্য ও উপায় বলে মনে করে। উপনিবেশগুলোকে স্ট্যালিন দেখেছেন সাম্রাজ্যবাদের প্রধান পশ্চাৎভূমি হিসেবে–ঠিক যেভাবে লেনিন দেখতেন। স্ট্যালিনের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ভোলে নি। পুঁজির মতো শ্রমেরও যে বিশেষ দেশ নেই–এই বোধটা সজাগ ছিল; এবং দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলনকে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমর্থন সমানে যুগিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তখন কোন আপোষ ছিল না।

হ্যাঁ, স্ট্যালিনের পদ্ধতিতেও ত্রুটি ছিল। যে আমলাতন্ত্র তার মৃত্যুর পর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিয়েছে তার গোপন লালন স্ট্যালিনের ব্যবস্থার মধ্যেই সংঘটিত হচ্ছিল। কিন্তু তিনি কোন অধনবাদী বিকাশের তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন নি, যেটা পরে এসেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে অনুপস্থিত জাতীয় বুর্জোয়া খোঁজায় ব্যস্ত হন নি, তাঁর পরবর্তীরা যেমনটা হয়েছিলেন। কেজিবি'র ওপর তিনিও নির্ভর করতেন, কিন্তু তাকে গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবেই জানতেন। বিপ্লবের প্রচারক মনে করতেন না।

৪.

মাও সে তুঙের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন হঠকারী, অতিবিপ্লবী, ইত্যাদি অনেক কথা বলেছেন; কিন্তু মাও যা বুঝেছিলেন সোভিয়েত নেতারা তা বোঝেন নি। কিম্বা বুঝতে চান নি। মাও বুঝেছিলেন যে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যে নীতি ক্রুশ্চভ নিচ্ছেন তা মোটেই সঠিক নয়; কেননা সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ কখনো সমাজতন্ত্রকে মেনে নেবে না, বরং তাকে ধ্বংস করতে চাইবে। যে জন্য তিনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, যেমন মার্কস–লেনিন বুঝতেন যে, সমাজতান্ত্রিক দেশের অভ্যন্তরেও শ্রেণী, কিম্বা শ্রেণী বিকাশের আশঙ্কা থাকে এবং যতদিন তা থাকবে ততদিন শ্রেণী সংগ্রাম অব্যাহত না রাখা হবে বিপজ্জনক কাজ। সোভিয়েত ইউনিয়ন বলতে শুরু করেছিল যে, পুঁজিবাদী দেশগুলোকে সে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় এমনভাবে হারিয়ে দেবে যাতে ওই দেশগুলো কমিউনিস্টদের ভক্ত হয়ে পড়বে, সেই লক্ষ্যকে তিনি হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কেননা তাঁর কাছে প্রতিযোগিতাটা অর্থনৈতিক ছিল না, ছিল মতাদর্শিক; অর্থাৎ সাংস্কৃতিক। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র দু'টি ভিন্ন ভিন্ন

সংস্কৃতি। একটির ভিত্তি শোষণ, অন্যটির ভিত্তি মৈত্রী। এই দুই কখনো এক লাইনে এগুবে না, অভিন্ন প্রতিযোগিতায় নামবে না।

মাও তাঁর নিজের হাতে গড়া কমিউনিস্ট পার্টির সদর দফতরে কামান দাগার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমনি এমনি দেন নি, তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, পার্টি চলে গেছে আমলাদের হাতে, যারা বিপ্লবের পক্ষে নেই, চেষ্টায় আছে নিজেদেরকে শক্তিশালী করার কাজে। মাও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা বলেছিলেন। তিনি জানতেন যে, একটি বিপ্লবী জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার ব্যস্ততার মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুশীলনের কাজটি ব্যাহত হয়েছে; এবং এ ও জানতেন যে, তার দেশের জনগণের ব্যাপক অংশই সাংস্কৃতিকভাবে পশ্চাৎপদ। তাঁর অবশ্যই খেয়াল ছিল যে পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী আদর্শের বিপরীতে একটি সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা সহজ কাজ নয়, কেননা পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ উভয়েই স্বাভাবিক, সমাজতন্ত্র স্বাভাবিক নয়–যেমন বর্বরতা স্বাভাবিক, সভ্যতা নয়। কেননা মানুষ হচ্ছে জন্মগতভাবেই স্বার্থপর, তাকে সাম্যবাদী করা স্রোতের অনুকূলে যাওয়া নয়।। বিপরীতে যাওয়াই বটে।

মাও সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করেছিলেন। তার সময় ছিল না যথার্থরূপে সংগঠিত করবার। আশপাশ থেকে সমর্থনও তেমন পাননি, যেজন্য কাজটি এলোমেলোভাবে ঘটেছে, অতিরেক পরিহার করা সম্ভব হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পর চীনে ক্ষমতা চলে গেছে রক্ষণশীলদের হাতে। তবে এই রক্ষণশীলরা এখন সংযত হয়েছেন গণতন্ত্রীদের বিপজ্জনক উৎপাত দেখে–যে 'গণতন্ত্রীরা' সেই কাজটিই করতে চেয়েছিল যা তারা সোভিয়েত ইউনিয়নে করে ফেলেছে, নিরুপদ্রবে।

স্ট্যালিন–পরবর্তী সোভিয়েত নেতৃত্বকে মাও বলেছিলেন সংশোধনবাদী। এখন বোঝা যায় কত যথার্থ ছিল সেই চিহ্নিতকরণ। মার্কসবাদ–লেনিনবাদকে সংশোধন করে করে এখন তারা তার হৃদপিণ্ডই উপড়ে ফেলে দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রেণীহীনতার স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই মিথ্যা তত্ত্ব প্রচার করে নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ গড়ে ওঠা এবং পার্টি আমলাদের দ্বারা সেই পুঁজি অপহরণ করার পথ তৈরী করে দিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, সে–রাষ্ট্রে এখন কোটিপতিদের আবির্ভাব ঘটেছে। কমিউনিস্ট পার্টি পুঁজিবাদী দেশে নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। কারণটা বোঝা যায়, নতুন পুঁজিপতিদের শিং গজিয়েছে, সে শিং তারা যেখানে–সেখানে ঘষছে। মূদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, নারী নির্যাতন, ভিক্ষা–বৃত্তিসহ সব পুঁজিবাদী অপরাধগুলো ফেরত এসেছে। মাতাল যুবকরা এখন যুদ্ধ করে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়, পুলিশের বিরুদ্ধে, রক এ্যাণ্ড রোল–এর মাঠে। সোভিয়েত নেতৃত্বকে পুঁজিপন্থী বললে তারা রাগ করতেন, ঘটনা প্রমাণ করছে তারা অন্য কিছু ছিলেন না।

মাও'য়ের চীন সোভিয়েতকে বলতো সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী। এখন প্রমাণ হচ্ছে সেই চিহ্নিতকরণও ছিল অভ্রান্ত। সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চাৎপদ দেশগুলোর জাতীয় মুক্তির আন্দোলনকে সমর্থন করার চাইতে সেখানে রাষ্ট্রীয় পুঁজি বিনিয়োগে বেশী আগ্রহ দেখিয়েছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যে সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে শক্তিশালী করে এই সত্য তারা উপেক্ষা করেছে, ভান করেছে যে তারা মুক্তিকামী দেশগুলোকে 'সাহায্য' করেছে। বড় লোক যেমন সাহায্য করে গরীব আত্মীয়কে। নিপীড়িত দেশগুলোতে তারা মুক্তিকামী কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নির্ভর না করে নির্ভর করেছে প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর এবং তেমন ধরনের কমিউনিস্ট পার্টিকেই সমর্থন দিয়েছে যেগুলো তাদের মতোই সংশোধনবাদী ও আমলাতান্ত্রিক এবং সেই সঙ্গে মস্কোর তাঁবেদার। তারা চিলিতে আলেন্দে এবং বাংলাদেশে শেখ মুজিবকে অতিরিক্ত বাহবা দিয়েছে, যার ফলে তারা উভয়েই নিহত হয়েছেন। আফগানিস্তানে তারা 'বিপ্লব' চাপিয়ে দেবে ভেবেছিল, যার দরুণ বিপর্যয় ঘটে গেছে এবং আফগানিস্তানের বামপন্থীরা এখন কোণঠাসাহচ্ছে।

৫.

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে বিচ্যুতির আশঙ্কা নতুন নয়। বিপ্লবের আনন্দঘন কালেই সে আশঙ্কা খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন অন্তত দু'জন–রোজা লুকজেমবুর্গ ও লিওন ট্রটস্কি; একজন লেনিনের বন্ধু, অপরজন স্ট্যালিনের প্রতিদ্বন্দ্বী।

রুশ দেশে যখন বিপ্লব ঘটে, রোজা লুকজেমবুর্গ তখন জার্মান ফ্যাসিবাদের কারাগারে। বিপ্লবের সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত উল্লসিত হযেছিলেন,কিন্তু সেই সঙ্গে বিপদের আশঙ্কা স্মরণ করেছিলেন। আশঙ্কাটা ছিল আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার, যে আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয় নি। লেনিন যেখানে সুশৃঙ্খল পার্টির ওপর জোর দিয়েছেন, রোজা সেখানে জোর দিতেন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর। ১৯০২ সালে লেনিন তাঁর ***কি করতে হবে*** বইতে বিপ্লবের জন্য অগ্রবাহিনী হিসেবে পেশাদার বিপ্লবীদের একটি সুশৃঙ্খল পার্টি গঠনের অত্যাবশ্যকতার কথা বলেছিলেন। তার জবাবে রোজা বলেছেন, দেখতে হবে এই পার্টি যেন জনগণের জন্য একটি শৃঙ্খল না হয়ে ওঠে। লেনিন ছিলেন অধিক বাস্তববাদী, রোজা অধিক স্বপ্নচারী। লেনিন বিপ্লব করেছেন, রোজা জার্মানদের হাতে শহীদ হয়েছেন। লেনিন দেখিয়েছেন যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগুতে দিলে তা চলে যাবে বুর্জোয়া মতাদর্শের বন্দীশালায়, সে জন্য আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করা চাই; আর এ কাজ পারবে শ্রেণীচ্যুত ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি। রোজা লুকজেমবুর্গ লেনিনের কেন্দ্রিকতাকে ভয় করেছেন; তার উদ্বেগ ছিল এই যে, ওই ধরনের সংগঠনে আমলাতন্ত্র দেখা দেবে। তার আগ্রহ ছিল শ্রমজীবী মানুষকে সুযোগ করে দেওয়ায়; যাতে তারা নিজেরাই এগিয়ে যেতে পারে,

উদ্যোগ নিতে পারে, এবং নিজেদের সৃষ্টিশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে আমলাতান্ত্রিক নিস্পৃহতাকে পদে পদে পরাভূত করতে পারে। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা চাই, তাদেরকে সৃষ্টিশীল করে তুলতে হবে। তিনি বলেছেন, "সরলভাবেই কথাটা বলা যাক। ঐতিহাসিকভাবে সত্যিকার বিপ্লবী আন্দোলনের ভুলগুলো অনেক বেশী উপকারী, দক্ষতম কেন্দ্রীয় কমিটির নির্ভুলতার তুলনায়।" স্ট্যালিন-পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রমাণ করেছে যে,রোজা লুকজেমবুর্গের উদ্বেগের পেছনে সত্যিকারের দূরদৃষ্টি ছিল।

রোজা লুকজেমবুর্গ আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সেটিও সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বলেছিলেন, যত দিন পুঁজিবাদ থাকবে ততদিন অপরাধ ও স্ব-বিরোধীতা থাকবেই। রোজা নিহত হন ১৯১৯এর জানুয়ারী মাসে; অত আগে তিনি যা বুঝেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংসকারী নেতৃত্ব তা অনেক পরে এসেও বুঝতে পারে নি। আসলে বুঝতে চায় নি; মতলব ছিল।

ট্রটস্কি অভ্রান্ত ছিলেন না। তার ভেতরও অতিরেক ছিল স্বপ্নচারিতার। স্ট্যালিনের সঙ্গে বিরোধটাকে তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রুশ বিপ্লবের সূচনাতেই এই মহৎ বিপ্লবী সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, বিপ্লবের পরিণতি সমাজতন্ত্রের দিকে যেমন এগুতে পারে, তেমনি আবার পুঁজিবাদের দিকেও ঘুরে যেতে পারে। সত্তর বছর পরে প্রমাণ হয়েছে যে,এই আশঙ্কাও মিথ্যা ছিলনা; সোভিয়েত ইউনিয়নে আজ পুঁজিবাদেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

বিপ্লব যে কোন সাময়িক ঘটনা নয়, সে যে একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া-এ সত্য সম্পর্কেও ট্রটস্কি বিপ্লবীদেরকে অবহিত রাখতে চাইতেন। অগ্রসর দেশগুলোতে শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্র করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর তিনি গুরুত্ব দিতেন। পুঁজিবাদের নিজের গৃহে যদি তার জন্য বিপদ সৃষ্টি করা যায় তবেই সমাজতন্ত্র নিরাপদ হবে-এই তত্ত্ব থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের 'আধুনিক' নেতারা সরে এসেছিলেন, ট্রটস্কি সরেন নি। ট্রটস্কি তথাকথিত সর্বহারা সংস্কৃতির পক্ষে ছিলেন না, তিনি শ্রেণী সংস্কৃতি চান নি, চেয়েছেন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি, যা হবে শ্রেণীর উর্ধ্বে এবং উর্ধ্বে বলেই হবে মানবিক। পুঁজিবাদী সংস্কৃতির আগ্রাসী ভঙ্গির মতো সর্বহারার সংস্কৃতির আক্রমণাত্মক ভঙ্গিও তার পছন্দ ছিল না। কিন্তু তিনি সব সময়েই ছিলেন আপোস-বিরোধী। পুঁজিবাদের সঙ্গে যে আপোস পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখা গেছে ট্রটস্কি সর্বদাই তার বিপক্ষে ছিলেন।

৬.

সত্তর বছর পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ যে সমাজতন্ত্র পরিত্যাগ করল, এতে কি প্রমাণ হয় যে তত্ত্ব হিসেবে সমাজতন্ত্র ভ্রান্ত? তা মোটেই প্রমাণিত হয় না।

সমাজতন্ত্রের যারা সমালোচক তারা গলা উঠিয়ে নামিয়ে বলতে ভালোবাসেন যে, এই মতবাদ যেমন অনৈতিক তেমনি অস্বাভাবিক। অনৈতিক এই জন্য যে, হাতের পাঁচটি আঙ্গুল সমান নয়, সমান করতে যাওয়া অন্যায় হবে। অবাস্তব এ জন্য যে, পাঁচটি আঙুলকে সমান করতে গেলে যে রক্তপাত ঘটাতে হবে, তাতে কেবল বড়ো আঙুলের অসুবিধা হবে না, পুরো হাতটাই যাবে অকেজো হয়ে। কথা সত্য। কিন্তু সত্য তো এটাও যে, পাঁচটি আঙুল সমান না হোক পাঁচটিই আঙুল বটে। সমাজতন্ত্রও এই কথাটাই বলে, সব মানুষ সমান নয়, মেধা, চেহারা, ওজন নানান দিক থেকেই ব্যবধান আছে, কিন্তু মানুষের সংস্কৃতিও কৃত্রিম, সভ্যতাও তাই, অথচ সংস্কৃতি ও সভ্যতাতেই মানুষের গৌরব; তেমনিভাবে সমাজতন্ত্রের কৃত্রিমতাতেই মানুষের মনুষত্ব রক্ষিত হয়, অন্য ব্যবস্থায় নয়। অন্য ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে অধিকারের ও সুযোগের সাম্য নেই, সুযোগের সমতা নেই; কাগজে থাকলেও কাজে নেই, সমাজতন্ত্র চায় এই অধিকার-সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে; মানুষের ওপর মানুষের শোষণের অবসান ঘটিয়ে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলবে; এবং আধুনিক পুঁজিবাদ যে ব্যক্তিকে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করে রাখছে সেই অপূর্ণতার জায়গায় ব্যক্তির যথার্থ বিকাশ ও চরিতার্থতার পথ খুলে দেবে। পুঁজিবাদ ব্যক্তির কথা বলে, সমাজতন্ত্র ব্যক্তির কথাই বলে; তবে ভিন্ন ভিন্নভাবে। পুঁজিবাদের ব্যক্তি আক্রমণাত্মক; সমাজতন্ত্রের ব্যক্তি বন্ধুসুলভ। পুঁজিবাদে অধিকাংশ ব্যক্তিই ব্যক্তিত্বহীন, সমাজতন্ত্রে সকলেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। আসলে এরা দুই ভিন্ন সংস্কৃতির ব্যাপার, যাদের মধ্যে আপোস সম্ভব নয়। ইউরোপে একদিন রেনেসাঁসের ঘটনা ঘটেছিল, তখন মানুষ ঈশ্বরকেন্দ্রিকতা বাতিল করে ইহজাগতিকতার প্রতিষ্ঠা ঘটালো, মানুষ নিজেই চলে এলো সবকিছুর কেন্দ্রে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সে যে মানবিকতার প্রতিষ্ঠা করলো তার সঙ্গে পুঁজিবাদ কিছু দূর এগিয়েছে। সহায়ক শক্তি হিসেবেই; কিন্তু কিছুটা গিয়ে আর পারে নি। পুঁজিবাদ শোষণনির্ভর, অল্প মানুষকে সমৃদ্ধ করে সে বহু মানুষকে দরিদ্র করে, এক পর্যায়ে এসে মানবতাবাদের বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে সে বাধ্য। করেছেও। ফরাসী বিপ্লব চেয়েছিল বন্দী মানুষকে মুক্ত করবে। কিছুটা করেছেও, কিন্তু আরো করার বাকি রইল। সাম্য এলো না, যথার্থ মৈত্রীও প্রতিষ্ঠিত হলো না, স্বাধীনতার ফল বুর্জোয়ারা খেয়ে নিলো। ফরাসী বিপ্লবের অঙ্গীকারকে গুণে ও পরিমাণে আরো এগিয়ে নেবার জন্যই রুশ বিপ্লব। রেনেসাঁসের সাংস্কৃতিক অভীপ্সাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে এ এক বৈপ্লবিক ঘটনা, ফরাসী বিপ্লবের মতোই তাৎপর্যপূর্ণ।

পুঁজিবাদের সমর্থকরা এও খেয়াল করেন না যে ওই বিপ্লবের পর পুঁজিবাদ আর আগের মতো নগ্ন থাকতে সাহস পায় নি। অনেক ক্ষেত্রেই ভদ্রতার পোশাক নিয়েছে এবং কল্যাণ রাষ্ট্রের পতাকা উড়িয়ে শ্রমজীবী মানুষের জন্য নানা রকমের ছাড় দিয়েছে।

সমাজতন্ত্রের ধারণাটি অর্বাচীন নয়, পুরানোই। কবি দেখেছেন, দার্শনিকও দেখেছেন বৈকি। যা নতুন তা হলো বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করে, তার বন্ধন ও ব্যাধি থেকে মানুষকে মুক্ত করার প্রয়োজনেই এর উদ্ভব। সমাজতন্ত্রের এই নূতন ধারণার রাজনৈতিক চরিত্রটি স্পষ্ট। রাষ্ট্রক্ষমতা সে দখল করতে চায়, তবে রাষ্ট্রকে আরো ভয়াবহরূপ দেবার জন্য নয়। রাষ্ট্রের সামাজিকীকরণ ঘটিয়ে তাকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলার লক্ষ্যে, ক্রমাগত দুর্বল করার অভিপ্রায়েই। তত্ত্বে নয়, ত্রুটি ছিল প্রয়োগে। সেটা স্বাভাবিক। মানুষ যেমন সশরীরে কখনো স্বর্গে যাবে না, তেমনি মানুষের কোন কাজই একেবারে নিখুঁত হবে না। খুঁত থাকবে। যা প্রয়োজন, তা হলো ত্রুটিগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়া যেমন সংশোধনের জন্য, তেমনি অগ্রগতির জন্য।

লেনিন একবার প্রশ্ন করেছিলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ও বার বার পিছু-হটা, ভুল ও প্রত্যাবর্তন ছাড়া কোন নতুন পদ্ধতি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমনটা কি ইতিহাসে কোন দিন ঘটে?' না, ঘটে নি। প্যারী কমিউনের প্রতিষ্ঠার সময় মার্কস-এঙ্গেলস আশা করেছিলেন যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুই মাস পরে কমিউনের পতন ঘটেছে। মার্কস-এঙ্গেলস হতাশ হননি, লেনিন সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে ৪৬ বৎসর পরে নিজের দেশে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। ৭০ বছর পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলো, কেন হলো সমাজতন্ত্রীদের কাছে সেটা স্পষ্ট। এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজতন্ত্রের আন্দোলন এগুবে।

৭.

সমাজতন্ত্রের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেয়েও বেশী প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়া এবং সমাজের চেয়েও বেশী দরকার সংস্কৃতির; কেননা সমাজ আত্মরক্ষামূলক, সংস্কৃতি অগ্রসরমান এবং অগ্রসর না হলে অগ্রগতি তো হয়ই না, আত্মরক্ষাও হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে আমলাতন্ত্রের বিকাশ এবং পুঁজিবাদের সাংস্কৃতিক অন্তর্ঘাত- যা অস্ত্রের আঘাতের চেয়েও মারাত্মক- দুই সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে এগুতে না দিয়ে পিছিয়ে দিয়েছে। মার্কস যথার্থই বলেছিলেন যে, মানুষই ইতিহাস তৈরী করে, কিন্তু যেমন ইচ্ছা তেমনিভাবে করতে পারে না। তৈরী করতে হলে দ্বন্দ্বগুলোকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ এবং তাদেরকে কাজে লাগিয়েই এগিয়ে যেতে হয়। ইতিহাস
সেভাবেই এগুবে। আগামী দিনের ইতিহাস পুঁজিবাদের নয়, স
কারা? অবশ্যই তারা যারা বঞ্চিত এবং তারাও যারা বি
নাইটে' এক চিঠি পাঠান।
সমাজতন্ত্রী নয়, বঞ্চিত যখন শ্রেণী সচেতন হয়
াস পড়েছি এবং এখন ইতিহাস
বঞ্চিতের ঐক্য প্রয়োজন, সাংস্কৃতিকভাবে।
কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততাকে বাদ দিয়ে নয়, সংগ
-জানোয়ার ও দানবের মত আচরণ
হতে হবে; এবং লক্ষ্য থাকবে জনগণের স
রোবেসপিয়ারে এবং দাঁতের বিরুদ্ধে।
কিন্তু এটা বলি যে, আপনারা প্রতিটি গুজব

সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘটনাবলী প্রয়োজন সত্যের অনুসন্ধান

রতন সেন

যুগ যুগ ধরে মানব জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত সাম্যের সমাজের জয়গান করে গেছেন। কেননা, এ সমাজই কেবল মাত্র প্রতিটি দেশ, জাতি ও মানুষের জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। তাই, শোষণ–বৈষম্য–বঞ্চনা যতদিন থাকবে, ততদিন মনীষীদের জয়গানকে কণ্ঠে ধারণ করে সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানুষের সংগ্রাম চলবেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘটনাবলী কি তা গতিরোধ করে দিল?

১.

গত ১৯ শে অগাস্ট ৯০ সোভিয়েত ইউনিযনে যে অভ্যুথান ঘটানো হোল তাকে সমকালীন বিশ্ব ইতিহাসের রাজনীতির গতিধারার সর্বতোভাবে বিপরীতমুখীনই বলা যায়। ১৯৯০ সালের শেষ প্রান্তে বাংলাদেশের মানুষের গণ–সংগ্রামকে অনেকেই আখ্যায়িত করেছেন গণ–অভ্যুথান বলে। আর এমনটাই ঘটেছিল ১৯৬৯–এর জানুয়ারীতে। এ দু'টোই ছিল সশস্ত্র শক্তিমত্তার বিরুদ্ধে জনগণের অভ্যুথান, জনগণই ছিলেন ঘটনাবলীর নায়ক। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে যা' ঘটেছে তা' হোল সশস্ত্র শক্তিমত্তার ওপর বাজী রেখে জনগণের মানসিকতা ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় উচ্চাভিলাষীর এ্যাডভেঞ্চার।

জগতটা পরিবর্তিত হয়েছে এবং হ'চ্ছে । কোন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক শক্তি
যেয়ে নিলো। ব্যবস্থা গণতন্ত্র ও মানব–ইচ্ছাকে অস্বীকার করে আর অগ্রসর হতে
জন্যই রুশ বিপ্লব। রেবে এবং যে কোন মতাদর্শ–সমাজতন্ত্র–সাম্যবাদ, ধনতন্ত্র কিম্বা
এক বৈপ্লবিক ঘটনা, ফরাসী বিপ্লবেঅস্তিত্বের যৌক্তিকতা ও গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চয়তা
পুঁজিবাদের সমর্থকরা এও খেয়াল দান করেই মাত্র করতে পারে।
আগের মতো নগ্ন থাকতে সাহস পায় নিঘটিত করে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের
এবং কল্যাণ রাষ্ট্রের পতাকা উড়িয়ে শ্রমজীতির ইতিহাসের ধারাকে চিরকালের মতো
৯০ তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে।

'৭৫-এর ফসল যারা উপভোগ করেছেন '৯০-এর গণজাগরণের নেতৃত্ব দানকারীদের অন্যতম অংশীদার ও মানবিক মূল্যবোধ-এ দুই'র মধ্যে সহাবস্থান সম্ভব নয়। বিএনপি যদি দলগত তথা দলের শীর্ষস্থানীয়দের ক্ষমতার পরিবর্তে গণতন্ত্রের ও মানুষের ক্ষমতাকে সংহত করতে ইচ্ছুক থাকেন তাহলে দ্বিধাগ্রস্ততার পথ তারা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে সক্ষম হবেন। অন্যদিকে আওয়ামীলীগ, বঙ্গবন্ধুর ভাষায় 'আত্মশুদ্ধি ও আত্মসমালোচনা'র মাধ্যমে যদি তাদের অতীত ভুল, ভ্রান্তি ও অপরাধের মূল্যায়ন না করে, তবে বলতেই হবে যে, তারা '৭৫-এর 'ক্যু'-কে নিছক দলীয় ইস্যুতেই পরিণত করতে চাইছেন, গণতন্ত্রের পথ ও গণতন্ত্রের ক্ষমতাকে শংকামুক্ত করার জাতীয় কর্তব্যকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন না।

একইভাবে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, ১৯শে অগাস্ট সোভিয়েত দেশের অভ্যুথান এবং সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের আদর্শ ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রক্ষমতার সহাবস্থান একেবারেই অচিন্তনীয়। সভ্যতার ইতিহাসে মানব সমাজ, বিশেষ করে তার প্রথিতযশা মনীষীগণ মানবতা ও সে সংগে শোষণ, বৈষম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের যে জয়গান করে গেছেন তার সারবস্তু আত্মস্থ করেই কার্ল মার্কস সমাজতন্ত্র সাম্যবাদের তত্ত্ব ও আদর্শকে বিশ্ব সভায় উপস্থাপিত করেন। মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন কখনই দাবী করেননি যে, তাদের তত্ত্ব এ মতবাদ হোল 'সর্বরোগের মহৌষধ'। তবু মতান্ধ ব্যক্তিরা কিম্বা অতি ভক্তি প্রদর্শনকারী খাঁটি বিপ্লবীরা মার্কসবাদকে সর্বরোগের মহৌষধ বলে চালাতে গিয়ে তাকে প্রাণহীন করে ফেলেছেন।

যাহোক, কেউ কেউ এখন প্রচার করছেন যে, অক্টোবর বিপ্লব ছিল জন সমর্থনহীন এক ষড়যন্ত্র এবং সোভিয়েত রাজ ছিল এক সন্ত্রাসী রাজত্ব। গোটা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদীদের একচ্ছত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে অক্টোবর বিপ্লব নিয়ে আসে এক গুণগত ভাঙ্গন। ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার চেঁচামিচি-অপপ্রচার শুরু করে; শেষ পর্যন্ত নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে সামরিক আগ্রাসনে নেমে পড়ে এবং সেদেশের গৃহযুদ্ধেও মদত যোগায়। কিন্তু সবকিছুকে ব্যর্থ করে দিল সোভিয়েত জনগণ। আবারও প্রমাণিত হোল যে, অক্টোবর বিপ্লব ছিল মানুষেরই বিপ্লব। সামরিক অভিযান প্রভৃতি ছিল 'সিভিলাইজড ইউরোপের' ভদ্র আবরণ। এর জবাবে 'আন-সিভিলাইজড বলশেভিকরা' যদি কিছু 'ভায়োলেন্ট এ্যাকশনে' লিপ্ত হয়ে থাকে তাহলে দোষটা কাদের?

ইতিহাসবাদী অর্লার্দ ফরাসী দেশের পত্রিকা 'লা-হিম্যানাইটে' এক চিঠি পাঠান। সালটা ১৯১৮। তাতে তিনি লেখেন, "আমি ইতিহাস পড়েছি এবং এখন ইতিহাস পড়াই।।এখন পড়ছি যে, বলশেভিকরা নাকি জন্তু-জানোয়ার ও দানবের মত আচরণ করছে।একই ধরণের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল রোবেসপিয়ারে এবং দাঁতের বিরুদ্ধে। আমি দু-এর মধ্যে তুলনা করতে চাইছিনা। কিন্তু এটা বলি যে, আপনারা প্রতিটি গুজব

অবশ্যই বিশ্বাস করবেন না।' এ চিঠির কথা উল্লেখ করে লেনিন বলেছিলেন–একজন বুর্জোয়া পণ্ডিত যখন এসব কথা লিখেছেন তখন আমাদের নতুন আর কী বা বলার থাকতে পারে?

আজ যারা 'সমাজতন্ত্রের অপরাধগুলোর' ফিরিস্তি দিয়ে চলেছে, তারা যেন সাম্রাজ্যবাদীদের অপরাধ ঢাকার উকিলে পরিণত হয়েছেন। এই অগাষ্ট মাসেরই ৬ই ও ৯ই তারিখ জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে কয়েক লাখ মানব সন্তানের প্রাণ বিনাশ করেছিল কারা? রণনীতিবিদদের মতে জাপানী সমর নায়কদের পরাজয় তখন ছিল অবধারিত। তবুও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এ্যাটম বোমা ফেলল শুধুমাত্র তার ধার পরীক্ষা করতে এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ভাবী প্রভুত্বের নিদর্শন রাখতে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রক্ষমতা সর্বদাই অগণতান্ত্রিক বলে প্রচারণা চালান হয়ে থাকে, তার সত্যতা কতটুকু? 'সকল ক্ষমতা সোভিয়েতগুলোর হাতে' এটা ছিল অক্টোবর বিপ্লবের প্রাণ, যা লেনিন কার্যকর করে তোলেন। নীতি নির্ধারণসহ প্রশাসনিক সকল স্তরে এ রূপরেখা তুলে ধরেন তিনি আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে। সোভিয়েত সদস্যদের মেয়াদ শেষের আগেই ফিরিয়ে "আনার অধিকারের"– Right to re-call–এর প্রস্তাব আনেন তিনি।কোন বুর্জোয়া দেশে এরকম কিছু করা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে পরিস্থিতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। সকল ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতের স্থলে দেখা দেয় 'সকল ক্ষমতা পার্টির হাতে'।

শেষ পর্যন্ত সে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে কিছু নেতার হাতে, বলতে কি 'মহান নেতার' হাতে। এভাবে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের আন্তঃসম্পর্কের প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা বিসর্জিত হয়ে যায়। গণ–শাসনের রাষ্ট্রীয় নীতির প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যে কোন বিচ্যুতি ঘটেনি এমন দাবী লেনিন করেননি। তেমনি সমাজতন্ত্রের আদর্শে দেশ গঠনেও যে কোন ভ্রান্তি দেখা দেয়নি তাও নয়। সমাজতন্ত্রে যাবার নতুন পথ "নয়া অর্থনৈতিক পলিসি" (নেপ) গ্রহণ সে সাক্ষ্যই বহন করে। এসময় লেনিন বারবারই বলেন যে, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তোরণ (সাম্যবাদের তো প্রশ্নই আসেনা) এক দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া। অন্তবর্তীকালে একাধিক ধাপ আমাদের অতিক্রম করতে হবে এবং সেগুলো যে কি ধরনের হবে তার 'রেডিমেড ফর্মূলা' আমাদের হাতে নেই ইত্যাদি। 'নেপ' চালু করার সময়ে তিনি বহু ধরণের সম্পত্তির কথা বলেন, সেজন্য 'বাম' কমিউনিস্টদের তীব্র সমালোচনা আসে যে, লেনিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পুঁজিবাদ ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। আমি অবশ্য সোভিয়েত দেশের সমকালীন ঘটনার সংগে তুলনা করতে চাইছিনা। কিন্তু ইতিহাসের কথাকে ভুলে যাওয়াও উচিত নয়।

লেনিনের মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে তার আমলে অনুসৃত রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারা বাতিল হতে থাকে, যেখানে প্রয়োজন ছিল লেনিনের ধারাকে আরও

পরিশুদ্ধ করে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার। সাম্রাজ্যবাদীদের হুমকি থেকে সোভিয়েত দেশকে রক্ষা করা এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবীদের নির্মূল করার নামে কী ধরণের কর্মকাণ্ড চালান হয়েছে, কম বেশী তা সকলেই জানা।,'ওসবই কুচক্রীদের অপপ্রচার'–এসব কথা বলে তো সত্যকে চাপা দেওয়া যায়না। সমাজতন্ত্র–সাম্যবাদের প্রবক্তাগণ গণতন্ত্র, মানুষ তথা মানবিক রাজনৈতিক মহলের মূল্যবোধ, কিম্বা সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিষয়গুলোকে কতটা গুরুত্ব দিতেন, সচেতন রাজনৈতিক মহলের তো এটা অজানা থাকবার কথা নয়। নতুন সমাজ সম্পর্কে লেনিনের ঐতিহাসিক বক্তব্য "Society of civilised Co-operators" রুচীসম্পন্ন কো–অপারেটরদের সমাজ।

মানব সমাজে সৃষ্ট সার্বজনীন জ্ঞান অনুশীলন করা অবশ্যই কর্তব্য। অর্থাৎ সত্য একমাত্র মার্কসের মধ্যেই পাওয়া যাবে–এটা সত্য নয়।

সমকালীন দুনিয়া বৈচিত্র্যে ভরা জ্ঞান রাশির সমাহার নিয়ে মানব সমাজে আত্মপ্রকাশ করছে। মার্কসবাদ স্থবির কিম্বা বন্ধ্যা মতবাদ নয়। তাহলে মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিকতার মর্মবস্ত (Dailectical Spirit) এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতা অনুসন্ধানের তত্ত্ব ও পদ্ধতিতে দূরে ফেলে দিতে হয়। সুতরাং বৈচিত্র্যময় সমাহারগুলোকে সাগ্রহে গ্রহণ করে সমাজতন্ত্র সাম্যবাদী আদর্শকে মানব সভ্যতায় অঙ্গীভূক্ত করে নিতেই হবে। অন্যথায় শ্রমজীবীদের মুক্তি কল্পনাতেই থেকে যাবে; অন্যথায়'বঞ্চিত অপর সকলের মুক্তির ব্যবস্থা না করে শ্রমিক শ্রেণী নিজেকে মুক্ত করতে পারেনা'–এই ঐতিহাসিক মিশন অনুধাবনে আমরা ব্যর্থ হব। এটা সংশোধনবাদ নয়। আমার মতে এটা হোল মার্কসবাদের বিপ্লবী দ্বান্দ্বিকতা (Revolutionary Dailcctice)। ১৯৬০ ও ১৯৭০–এর দশকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ছিল উদ্বেলিত। পদানত বহু জাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে নিজেদের পছন্দমত জাতীয় বিকাশ অর্জনে যার যার মত করে প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়।নয়া বিশ্ববাদের প্রবক্তা মার্কিন কর্তারা এসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে কীভাবে হত্যা 'ক্যু'র মাধ্যমে অপছন্দের সরকারগুলোকে সরিয়ে সামরিকতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মদত যুগিয়েছে, ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। কিন্তু '৮০র দশকের মধ্যভাগ থেকে ইতিহাসের প্রকৃত নিয়ন্তা, মানবশক্তির নবজাগরণ দেখা দেয় তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে। বাংলাদেশেও তার অন্যতম। গণতন্ত্র ও জাতীয় বিকাশের পথ বাছাই'র অধিকারের দাবীতে জনগণ জেগে ওঠে। 'নয়াবিশ্ববাদ' এবং সমগ্রভাবে বিশ্বধনতন্ত্রের পরিচালকবর্গ নতুন বিশ্ব পরিস্থিতির সংগে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে, রাজনীতি ও আদর্শকে এগিয়ে নিতে কৌশলের বদল ঘটায়। আমাদের দেশের জন্য তারা নিয়ে এল 'উন্নয়ন ও গণতন্ত্র'।

এদিকে, দলগঠন ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাসহ বহুদলীয় গণতন্ত্র এক সার্বজনীন রাজনৈতিক দাবীতে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি রাজনৈতিক ধারাতে ন্যায় বিচারের প্রশ্নটিও ক্রমে জোরদার হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যের নায়করা এ পরিবর্তনের

আলামতগুলিকে আগেভাগে বুঝে নিতে পারলো। ওরা পুরানো, ওরা অনেক বেশী স্বার্থ-সচেতন। কিন্তু সময়মত বুঝল না কথিত সমাজতান্ত্রিক শাসক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ছেড়ে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্বের নামে নেতৃত্বের একনায়কত্ব, মতান্ধতা, গণতন্ত্র ও বিবেকের স্বাধীনতা দান সংক্রান্ত মার্কসবাদের প্রকৃত আদর্শের লংঘন-যা এনে দিল জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা। আত্মসন্তুষ্টি প্রভৃতির কারণেই চূড়ান্ত মাশুল দিতে হোল কথিত কমিউনিস্ট নেতাদের। মাশুল দিতে হচ্ছে আমাদেরও। দিতে হচ্ছে মুক্তি ও প্রগতির জন্য সংগ্রামকারী জাতিগুলিকে।

১৯শে অগাস্ট মতান্ধতার প্রবক্তারা তাদের ভাষায় 'মাতৃভূমির মুক্তির জন্য' অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করলেন, সে পদ্ধতির সংগে সমাজতন্ত্রের আদর্শিক পথের কোন সম্পর্কই নেই। ক্যু-দে-তা সকল অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। সেটাই আমি লক্ষ করছি গোটা সোভিয়েত দেশে। উৎফুল্ল তাই পাশ্চাত্য দুনিয়ার নেতারা। প্রখ্যাত কুটনীতিক-রাজনীতিক মিঃ গনক্রেথ ম্যানিলায় এক ভাষণে বলেছিলেনঃ পরিবর্তিত পরিস্থিতি থেকে পুঁজিবাদ কিছুটা শিক্ষা নিয়েছে। সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা এখানেই যে, সে সময়মত শিক্ষা গ্রহণ করল না ইত্যাদি। এ মূল্যায়নের সংগে দ্বিমত পোষণ না করে বলি-আদর্শ ও সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্রের এবং সাধারণ ভাবে কমিউনিস্টদের ব্যর্থতা বলে প্রচারের যে ঢেউ তোলা হচ্ছে, সেটা আদৌ সত্য নয়। মার্কসবাদের বক্তব্য হোলঃ সমাজ বদলায়, সংগে মানুষও বদলায়। কিন্তু বদলালো না কমিউনিস্ট নেতৃত্বের অনেকেই। ব্যর্থতা এই স্থবিরতার। ব্যর্থতা 'যান্ত্রিক বস্তুবাদী তত্ত্বে আচ্ছন্ন' কমিউনিস্টদের- যারা অনেকাংশে গড়ে তুলেছেন এবং সমর্থন দিয়েছেন এক যান্ত্রিক সমাজ ও যান্ত্রিক সভ্যতাকে।

এমতাবস্থায় সোভিয়েত দেশের মানুষের মধ্যে থেকে যদি সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও ক্রোধের প্রকাশ ঘটে থাকে, তাতে আমি বিস্মিত ও বিচলিত বোধ করতে চাইছি না। উদ্বেগের কারণ এখানেই যে, সংস্কার প্রবর্তনের অজুহাতে খোলামেলা গণতন্ত্রের বিকৃত সৃষ্টি 'বাজার রাজনীতির' নৈরাজ্যকে কাজে লাগিয়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে ফিরে যাওয়ার জন্য সেই সনাতনী কমিউনিস্ট বিরোধী জিগিরের আশ্রয় নিতে পারছে বলে কিছু কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণেই আগষ্টের ক্যু-দে-তা। বাংলাদেশের মানুষ জগতের মানুষের মত, ক্যু-দে-তাকে ঘৃণা করে-সেটা ঢাকাতেই হোক কিম্বা মস্কোতেই হোক।

২.

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বলছেন, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব থেকে গরবাচেভের ইস্তফা সারাবিশ্বে কাউনিস্ট আন্দোলনের মৃত্যু ঘন্টার ইংগিত বহন করে। এ খবর বেরিয়েছে দৈনিক সংবাদের ২৮শে অগাস্টের সংখ্যাতে। গরবাচেভ সোভিয়েত

ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হওয়ার বহুকাল আগ্ থেকেই পৃথিবীর ৫টি মহাদেশের অসংখ্য দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন চলে আসছে। বুশ তা ভাল করেই অবগত আছেন। নিজ নিজ দেশের বাস্তবতা অনুযায়ী এসব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো জাতি ও জনগণের মুক্তির ও প্রগতির জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছেন। এই তো সেদিন বুশ সাহেবদের 'স্বপ্নের জমিদারী' ল্যাটিন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সম্মেলন ঐকমত্যে পৌছেছে যে, স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও জাতীয় বিকাশের পক্ষে প্রধান প্রতিবন্ধক হোল সাম্রাজ্যবাদ, যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলতেই থাকবে। বুশ সাহেবরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপর তাদের নয়া উপনিবেশবাদী থাবা বিস্তার করে আছেন এবং এখন তাদের ভাষায় 'কমিউনিজমের পতনে'র পর সে থাবাকে নানা কৌশলে শক্ত করতে চাইছেন।

এই তো ক'দিন ধরে আমরা লক্ষ্য করছি কীভাবে বিশ্ব ব্যাংক ও আই, এম, এফ, আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চাইছেন। এর সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হোল, সরকারী কর্মচারীদের বেতন কেন বৃদ্ধি করা হচ্ছে সে বিষয়ে দুই ধনতান্ত্রিক বহুজাতিক সাহায্য সংস্থার তরফে নানাবিধ 'প্রতিশোধ' নেবার হুমকি। বাংলাদেশের কোন দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক মহলই এ ধরনের চাপ বা হুমকিকে মেনে নিতে পারে না। কেননা, এর সংগে জড়িত হয়ে আছে জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় মর্যাদা। একটি দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা সর্বদাই এ প্রশ্নে প্রতিবাদ আন্দোলন করে আসছে এবং করবে। গরবাচেভের ইস্তফাতে তা বন্ধ হবে না।

আর যদি বলা হয় সমাজতন্ত্রের কথা তবে তার জবাবে আমি এটাই বলব– বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা বার বারই বলেছেন প্রকৃত জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রশ্নের ফয়সালা না করে সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রা করার কোন বাস্তব প্রেক্ষিতই তৈরী হয়না। তদুপরি আমি মনে করি, সমকালীন দুনিয়াতে যে অভিনবত্ব নিয়ে, ব্যাপক জনসমষ্টির মানব–ইচ্ছা রূপলাভ করছে, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ও আর্থ–সামাজিক আধারের (content) প্রতি যে আগ্রহ ও সংগ্রাম–ইচ্ছা উন্মিলিত হচ্ছে ও হবে, সময় সাপেক্ষ হলেও, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে ব্যাপক জনসমাজ–অতীতে যেমনটা দেখা যায়নি– সাধারণভাবে শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে। শুধু কমিউনিস্টরাই নয়, একাধিক সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি, বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক মতবাদ থেকে দূরে অবস্থান নিয়েও মানবিক মূল্যবোধের মহতি তাগিদেই অগ্রসর হয়ে আসবে। সমাজতন্ত্র–সাম্যবাদী আদর্শ মানবিক মূল্যবোধকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সুতরাং মানবিক মূল্যবোধকে প্রকৃতই যারা উর্ধ্বে তুলে ধরতে চাইবেন তাদের সবার সাথে inter-action-এ আন্তঃসম্পর্ক ভিত্তিক ক্রিয়া কলাপে লিপ্ত হতে কমিউনিস্টরা

সম্মত হবে। নিজ নিজ দেশের বাস্তবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে মানুষের কাছে, বিশেষ করে পিছিয়ে থাকা মানুষ, যাদের বিশাল অংশই হোল মেহনতি মানুষ, তাদের কাছে, জগতের গতিময়তার সংগে সংগতি রক্ষা করে সমাজতন্ত্র সাম্যবাদের আদর্শকে ক্রমান্বয়ে গ্রহণযোগ্য করে তোলাই হচ্ছে কমিউনিস্টদের মৌলিক কর্তব্য। তত্ত্বের গোড়ামী এমনকি নামের 'প্রতি চিরায়ত আসক্তি' দিয়ে এ মৌলিক কর্তব্যকে বাধাগ্রস্ত করে তোলা উচিত হবে না। যতদূর মনে পড়ে প্রাচ্যের কমিউনিস্টদের সম্মেলনে লেনিন বলেছিলেনঃ আপনাদেরও কমিউনিজমের জন্য লড়তে হবে। কিন্তু এ অঞ্চলের জনগণ যে ভাষাতে বুঝতে সক্ষম, আপনাদের সেই ভাষাতেই কথা বলতে হবে (You must speak in the language they understand)।

আমি মনে করি এই ল্যাংগুয়েজ শব্দটিকে আক্ষরিক অর্থে লেনিন ব্যবহার করেননি। বিষয়টি অতি গভীর ও ব্যাপক অর্থবহ। আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, মানুষের চলমান বিশ্বাস, মানসিকতা ইত্যাদি ফ্যাক্টরগুলোকে গুরুত্ব দিয়েই অগ্রসর হবার উপদেশ তিনি দেন। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট ও বাম প্রগতিশীলদের বিষয়টিকে নিয়ে যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিত। ধনতন্ত্রই জন্ম দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদকে। ১৯৪১ সালের জুনে ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গ সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করার পর ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ধরেই নিয়েছিল যে, সোভিয়েত দেশের পরাজয় অবধারিত। কিন্তু মনুষ্য সমাজ যারা বিশ্ব সভ্যতা গড়ে তুলেছে ফ্যাসিবাদের মধ্যে তারা দেখেছে সভ্যতা-সংস্কৃতি সৃষ্টির ব্যাপক বিনাশ। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভেতরে জীবন ধারা কাটাচ্ছে, সেই জাতিগুলো ফ্যাসীবাদের বিজয়ের মধ্যে তাদের জাতীয় অস্তিত্বের অবদমনকে নিশ্চিত ভবিতব্য বলে গ্রহণ করল। জনগণের এই মানবিক ও গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের দিকে নজর দিয়ে এবং একই সংগে অবধারিত পরাজয়ের ক্যালকুলেশন ব্যর্থ হবার মুখে এসে পড়াতে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ষ্ট্রাটেজি বদল করে আসরে অবতীর্ণ হয়।

সোভিয়েত জনগণের কাছে ফ্যাসি বিরোধী যুদ্ধ ছিল এক মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ। দেশকে রক্ষার জন্য সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের সকল জাতির ২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ যাদের মধ্যে ছিল অসংখ্য কমিউনিস্ট, অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দেন। সোভিয়েত দেশের বাইরেও অসংখ্য জাতির অগণিত মানুষের আত্মত্যাগে ভাস্বর ছিল ফ্যাসিবাদ বিরোধী বিজয়। বিশ্ব পরিসরে এ ছিল ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলোর এক সার্বজনীন জাতীয় চরিত্রের গণতান্ত্রিক জাগরণ। ইউরোপে, বলতে কি গোটা পৃথিবীতে এক নয়া শক্তি বিন্যাস গড়ে উঠে। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জন ও পুনঃস্থাপন, গণতান্ত্রিক জাতীয় বিকাশ এবং সংযোগ মানবিকতা তথা মানবিক মূল্যবোধ সিঞ্চিত সংস্কৃতি-সভ্যতার বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া-এগুলোই ছিল ফ্যাসি বিরোধী লড়ায়ের মর্ম। দুর্ভাগ্যের বিষয় হোল এই ফ্যাসিস্ট কবলিত ইউরোপীয় জাতিসমূহের

মুক্তিলাভ লালফৌজের অবদানকে অনেকটা দেবতার আশীর্বাদ হিসাবে রূপদান, কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের শক্তির অতি মূল্যায়ন এবং পাশাপাশি দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক জাতীয় শক্তিসমূহের ভূমিকার অবমূল্যায়ন ইত্যাদি কারণে যে ইচ্ছাবাদের (Voluntarism) জন্ম দেয় তা গড়ে ওঠা শক্তি বিন্যাসের প্রকৃত তাৎপর্য এবং জাতি ও জনগণের প্রকৃত রাজনৈতিক–সামাজিক আকাঙ্খা অনুধাবনে ব্যর্থতা এনে দেয়। সামগ্রিক জাতীয়, পুনরুজ্জীবনের সাধারণ গণতান্ত্রিক কর্তব্যসমূহ কার্যকারণের নীতিকে বাতিল করে সরাসরি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বাস্তবসম্মত ছিলনা–তাই তারা পুনরুজ্জীবনের শ্লোগানকে উর্ধ্বে তুলে ধরেন এবং এ জাতীয় কর্তব্যে মেহনতিদের জাগিয়ে তোলেন। যুদ্ধোত্তর কালে জাতীয় নির্বাচনে তাই তারা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু ইতিহাসের এ শিক্ষা কমিউনিস্ট আন্দোলন যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারলনা বলেই আমি মনে করি। প্রসঙ্গতঃ বলি, কমিউনিস্ট ও বাম–প্রগতিশীলরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেই তাৎক্ষনিকভাবেই সমাজতন্ত্র নির্মাণ এজেন্ডা হয়ে দাঁড়ায় না। ইতিহাস যে সব কর্তব্য অসম্পূর্ণ রেখে গেছে, সেগুলি যদি বুর্জোয়া–গণতান্ত্রিক চরিত্রেরও হয়, তবে সেগুলোকে বাস্তবায়ন করতেই হবে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা সমাজ বিকাশের দ্বান্দ্বিকতা, কোন কিছুকেই অস্বীকার করা চলেনা। এটা মার্কসবাদ সম্মতও নয়। আমাদের খতিয়ে দেখা উচিত, পূর্ব ইউরোপ এমনকি সোভিয়েত দেশেও এ ধরনের কিছু ঘটেছে কিনা।

রাজতন্ত্র–সামন্ততন্ত্রের অচলায়তনকে ভেংগে পুঁজিবাদ এক সময় নিজের অবাধ বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করে নেয়। এজন্য উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও মতাদর্শগত অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। পরিশেষে বিপ্লবের মাধ্যমেই ক্ষমতা করায়ত্ব করা হয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণী মতাদর্শ, রাষ্ট্রীয়–রাজনৈতিক কাঠামোর রূপরেখা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সমাজের কাছে তুলে ধরেছে। এটা তারা করতে পেরেছেন বাস্তবতার কারণেই। ইতিহাসই তাদেরকে পথ করে দিয়েছে। বুর্জোয়া মনীষীদের আবির্ভাব ভৌতিক কিছু নয়; তাদের মতবাদ–সংগঠন–আন্দোলনও আকাশ থেকে পড়েনি।

তেমনি মার্কস–এঙ্গেলস–লেনিনের বিশ্ব পরিচয় কোন অলৌকিক কারণ কিংবা মাল্টিমিলিয়নিয়র গোষ্ঠীর ভাড়াটিয়া প্রচার যন্ত্রের সৌজন্যে ঘটেনি, সমাজতন্ত্র কমিউনিজমের মতাদর্শও আকাশ থেকে পড়েনি। সামগ্রিকভাবে বিশ্ব পুঁজিবাদ মানবসমাজকে যা দিতে চেয়েছিল তা, দিতে তো পারেইনি; বরং নিজেদের আত্মকেন্দ্রীক (Ego-centric) শ্রেণী স্বার্থের কারণে বার বারই মানব সভ্যতার বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম অপরাধ করেছে এবং আজও করে চলেছে। সেজন্যই তো সমাজ সভ্যতাকে নতুন ভিত্তিতে অপরাধ মুক্ত, মানবিক, সাচ্চা গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন, ‘সবকিছু মানুষ ও মানুষের কল্যাণের জন্য’–এসবের ভিত্তিতে গড়ে তুলবার জন্য

ইতিহাসের দাবী ধ্বনিত হতে থাকে। সে দাবীতে সাড়া দিয়েছে বিশ্বের কমিউনিস্টরা। গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সময়ে বভিন্ন রূপে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন। অলৌকিক কিছু হলে বলতামঃ মার্কস-এঙ্গেলসঞ্জ লনিন যা করেছেন, তার সবকিছুই নির্ভূল ও চিরসত্য। কমিউনিস্ট আন্দোলনেরওকোন ত্রুটি বিচ্যুতি ও বিকৃতি হয়নি, হচ্ছেনা বা হবে না। ইতিহাসের যে দাবীর ধ্বান্তি হওয়ার কথা আমি উল্লেখ করেছি, মানুষ সমাজ যেদিন তা বাস্তবায়িত করে তুলক্তে পারবে, আমার মনে হয় যেদিন কমিউনিস্ট আন্দোলনের এবং তার সহযোগী প্রগতিশীল রাজনৈতিক-সামাজিক আদর্শিক আন্দোলনসমূহেরও প্রয়োজনীয়তা আর থাকবে না। এরকম ভবিষ্যৎবাণী করাটা আমার পক্ষে আহম্মকী হচ্ছে জেনেও মনের কথা আমি খুলেই বললাম।

লেনিন এক সময় বিদ্রুপ করে বলেছিলেন ঃ এই বিপ্লবীরাই বিপ্লবের নামে বিপ্লবের ক্ষতি সাধন করছে। ঠিক তেমনি আমরা যেন মার্কসবাদ লেনিনবাদের তথাকথিত পবিত্রতার নামে তার যেন আর ক্ষতি সাধন না করি।

একটি গানের প্রথম পঙক্তির কথা মনে পড়ল। অনেকেই নিশ্চয় শুনেছেন; গেয়েছেন প্রখ্যাত শিল্পী প্রয়াত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। পংক্তিটি এরকম- খিড়কি থেকে সিংহ দুয়ার, এই তোমাদের পৃথিবী ,এর বাইরেও জগত আছে তোমরা জাননা, তোমরা তা-ও কি মানো না…। অন্যের কথা বলতে পারিনা, কিন্তু একজন কমিউনিস্ট হিসেবে সহমর্মী সকলের কাছে আবেদনঃ আমরা যা জানি তার বাইরেও জগত আছে, সে জগতকে আমাদের জানতেই হবে। এটাই মার্কসবাদের চিরন্তন বাণী। আর এমনটা করা হোলে, ইতিহাসের সম্পদ ভাণ্ডার মার্কসবাদ জীবন নিয়েই বেঁচে থাকবে।

সোভিয়েত–সমাজতন্ত্রে ঘুণপোকার ভূমিকা

আহমদ রফিক

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় নিয়ে গোটা বিশ্বে আনন্দ ও বেদনার ঢেউ কিছুটা স্থির হয়ে এলেও তা মিলিয়ে যাবার নয়। নানা প্রসঙ্গে এবং স্থানিক ও বিশ্বরাজনীতির বিভিন্ন দিক কেন্দ্র করে বারবার বিষয়টি আসছে; আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্ব, এমন কি ভারত, বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে মনে হয় এর অভিঘাত সবচাইতে বেশী। এর কারণ কি কাজের চেয়ে তত্ত্ব নিয়ে আমাদের বেশী কচকচি?

কারণ যাই হোক, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এই সব অঞ্চলের রাজনৈতিক–সাংস্কৃতিক অঙ্গন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ চিন্তার যৌক্তিকতা প্রতিপাদনে ব্যস্ত। এর মধ্যে দুই একটি শক্তিমান পত্রিকাগোষ্ঠী এবং তাদের অনুসারী সাংবাদিক–লেখক বুদ্ধিজীবী এখনও সমাজতন্ত্রের সমাধিলিপি রচনায় মহা–উৎসাহী। অন্যদিকে তাদের প্রতিপক্ষ দুর্বল কণ্ঠে হলেও সমাজতন্ত্রের পক্ষে পালটা বক্তব্য পরিবেশন করে চলেছে।

সত্যি বলতে কি যারা মনে করেন, ভুল–ভ্রান্তি এবং সাময়িক পতন সত্ত্বেও বর্তমান সমাজে সমাজতন্ত্রের আদর্শ এখনও অগ্রসর চিন্তার প্রতীক এবং এর চেয়ে উন্নততর সামাজিক–অর্থনৈতিক আদর্শ এখনও দেখা যায়নি, তাদের পক্ষেই দরকার ভাবাবেগে তাড়িত না হয়ে বাস্তব অবস্থার মুখোমুখী হওয়া, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের আত্ম–অন্বেষার কাজ শুরু করা এবং নির্মোহ ও দীর্ঘ বিচার বিশ্লেষণে এর প্রায়োগিক ত্রুটি বিচ্যুতির রোগ নির্ধারণের চেষ্টা চালানো। একমাত্র যুক্তিনির্ভর খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে এর দুর্বলতা–সবলতার বিন্দুগুলো পরিস্ফুট হতে পারে, বেরিয়ে আসতে পারে কিছু অপ্রিয় সত্য, সেদিকে চোখ বুঝে থাকলে চলবেনা। তাতে বরং সমাজতন্ত্রের মতাদর্শগত স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে।

আমাদের আলোচনায় সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রে পতন এবং গণতন্ত্রের নামে দেশটির খন্ডবিখন্ড হয়ে যাওয়ার প্রধান সম্ভাব্য কারণের দিকেই নজর দেওয়া হয়েছে, যদিও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো অই ধ্বস–নামা ভাঙ্গনের বাইরে নয়। তবে ওদের তত্ত্বগত কারণ মূলত এক হলেও সমস্যা অনেকাংশে ভিন্ন, যা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে আলোচ্য।

বাস্তবিক, সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতন একাধিক কারণে বিশ্বরাজনীতিতে একটি ধ্বসনামা ঘটনা। প্রায় পৌনে একশত বছরের একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরাশক্তির পর্যায়ে উঠেও কেন মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সেই কারণ অনুসন্ধান সাধারণভাবে রাজনীতির তত্ত্বগত স্বার্থেও প্রয়োজন, আর সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসীদের পক্ষে এই বিশ্লেষণ তো অস্তিত্বের প্রশ্ন। শুধু সাম্রাজ্যবাদী কূটচক্রান্ত ও তাদের গোপন তৎপরতার উপর সর্বদায় চাপিয়ে অব্যাহতি মিলবে না। এবং এটা যে একমাত্র কারণ হতে পারে না সেই বাস্তবতা বোধও আমাদের থাকা উচিত। এখানে ফাঁকি চলবে না।

পশ্চিমা গণতন্ত্রের প্রবক্তাদের মতে এটা সমাজতন্ত্রের উপর পুঁজিবাদের মতাদর্শগত বিজয়। এই দাবির কতটা সত্য, কতটা তাদের তুখোড় প্রচারণা ও কুটকৌশল এবং কতটা সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ ঘটিত ভুলত্রুটি সেটাই সমাজতন্ত্রীদের আজ বিবেচনার বিষয়। আর এই ত্রুটির কতটা প্রয়োগে এবং সেখানে আদর্শগত দিকের তাত্ত্বিক ত্রুটির কোন প্রতিফলন রয়েছে কিনা সেটাও অবশ্য বিচার্য। যদি কোন ধরনের গলদ থেকেই থাকে তাহলে কোথায় গলদ, কেন গলদ, কেমন করে গলদ ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব অবশ্যই পেতে হবে।

এই গলদের খোঁজে যেতে হয় রুশ বিপ্লবের রাষ্ট্রীয় প্রতিফলনের এবং বিপ্লবের ধারক এবং বিপ্লবের রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচালক পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো ও তৎপরতার চরিত্র বিচারের হিসাব নিকাশে। একথা সবাই জানি যে, রুশ বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল প্রোলেতারিয়েত তথা সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা এবং বিপুল গণজাগরণের মাধ্যমে শোষিত সাধারণ মানুষকে আত্মশাসন ও রাষ্ট্রশাসনের উপযুক্ত করে তোলার জন্য অব্যাহত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। এই সংগ্রাম চলে পার্টির ভিতরে, চলে পার্টির বাইরেও জনগণকে সংশ্লিষ্ট করে।

কিন্তু এই লক্ষ্য কি সোভিয়েত পার্টিতে এবং সোভিয়েত শাসন ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়েছিল? জবাবে বলা যায়, সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের এবং শ্রমিক–কৃষকের কার্যকরী অংশগ্রহণের বদলে পার্টি–একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার নীতিই গ্রহণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই নীতিরই অন্ধ বিস্তার ঘটেছে এবং কালক্রমে এই ব্যবস্থা জগদ্দল পাথরের মত স্থবির হয়ে উঠেছে। এমনি করে পার্টিকে ঘিরে এক কঠিন আমলাতন্ত্রের বিস্তার, ব্যাপক শক্তি সঞ্চয়, যার সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বৃত্তের যাত্রা কখনোই কোন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কর্মকান্ডে সর্বহারা শ্রেণীর ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে না। পারে না তাদের নেতৃত্বে পৌছানোর অনুকূল পরিবেশ ও তৎপরতার সৃষ্টি করতে যে–তৎপরতা কৃষি শিল্পের উৎপাদন অপরিমেয় সমৃদ্ধিতে ভরে তুলবে এবং

তা জনগণের প্রয়োজন ছাড়িয়ে নিয়ে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণে সহায়ক হবে; বিশেষ কোন শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধায় সীমাবদ্ধ থাকবে না।

কিন্তু রুশবিপ্লব ও তার রাষ্ট্রব্যবস্থার তত্ত্বগত যাত্রা স্বীকৃত পথের বদলে পার্টি-একনায়কত্বের এবং পার্টি আমলাতন্ত্রের পথ ধরাটাই সঠিক মনে করে নিয়েছিল। এই লক্ষ্যের চরম প্রকাশ ঘটেছে স্তালিন আমলে, এবং তার পরে তো আরেক বিকৃত যাত্রা। কিন্তু এজন্য স্তালিনকে একা দায়ী করা ঠিক নয়। এই প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছে আরো আগে লেনিনের আমলে, বিশেষ করে তার জীবদ্দশার শেষ দিকে থেকে। তাছাড়াও বিশ্বের অন্যত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা ক্ষীণ বিবেচনায় 'একটি দেশেই সমাজতন্ত্র' লালন করার নীতি রক্ষণশীল সংকীর্ণতা ও আত্মকেন্দ্রীকতার পটভূমি তৈরিতে সহায়তা করেছে, সে প্রসঙ্গে অবশ্য পরে আসছি।

কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে শুরুতে সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থে হলেও পার্টি একানায়কত্বের (শুরুতে পার্টি-আমলাতন্ত্রের নয়, কারণ তখনও স্বার্থপরতাহীন মতাদর্শের শিখা উত্তাপ দিয়ে যাচ্ছিল, ব্যক্তিস্বার্থ তখনও প্রধান্য পায়নি) পত্তন লেনিনের হাতেই। সেই ১৯১৯ সালে লেনিন বলেছেন পার্টি একনায়কত্বের কথা। বলেছেন, 'এর উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি এবং এখান থেকে আমরা সরে আসতে পারি না।'

কিন্তু তখন এর কারণ ছিল, যুক্তিসঙ্গত কারণই ছিল। খোলা হাওয়ার নৈরাজ্যে নব লব্ধ বিপ্লবের ফসল নষ্ট করে দেওয়া চলেনা এজন্যই সেসময় মতভেদের স্বাধীনতা তার কাছে মনে হয়েছে ইন্টেলেকচ্যুয়াল 'বিলাসিতা'। আর সেজন্যই অরাজকতা, বিশৃংখলা, গৃহযুদ্ধ, ষড়যন্ত্র ইত্যাদির বিরুদ্ধে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে হাতে লাগাম শক্ত করে ধরতে হয়েছে লেনিনকে।

তখন নব্য সোভিয়েত রাষ্ট্রের ঘরে বাইরে শত্রু। গৃহযুদ্ধ চলছে। সাম্রাজ্যবাদীরা নয়া সমাজবাদী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য প্রতিবিপ্লবের শক্তিকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে চলেছে। এই কাজটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এত নগ্ন এবং এতটা ন্যক্কারজনকভাবেই করেছিল যে, দীর্ঘ এক যুগ পর রাশিয়ায় ভ্রমণকালে শান্তিবাদী অমার্কসবাদী (এবং একনায়কত্বের বিরোধী) রবীন্দ্রনাথও কথাটা স্বীকার করেছেন। এবং স্বীকার করেই ক্ষান্ত হননি, সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়া সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষ সমর্থন করে বলেছেনঃ

এদের ''ঘরে-বাইরে প্রতিকূলতা, তাদের মধ্যে আত্মবিদ্রোহ সমর্থন করার জন্য ইংরেজ এমন-কি আমেরিকানরাও গোপনে ও প্রকাশ্যে চেষ্টা করছে।----সম্রাট যখন গুষ্টিসুদ্ধ গেল সরে তখনো তার সাঙ্গোপাঙ্গরা দাপিয়ে বেড়াতে লাগল, তাদের অস্ত্র এবং উৎসাহ জোগালে অপর সাম্রাজ্যভোগীরা।----

ইতিমধ্যে ঘরে বাইরে এদের প্রচন্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়ে চলতে হয়েছে। এরা একা, অত্যন্ত ভাঙ্গাচোরা একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার বোঝা নিয়ে। পথ পূর্বতন দুঃশাসনের

প্রভৃত আবর্জনায় দুর্গম। অর্থসম্বল এদের সামান্য। দেশের মধ্যে কলকারখানা যথেষ্ট পরিমাণে না থাকাতে অর্থ উৎপাদনে এরা শক্তিহীন। অথচ রাষ্ট্র ব্যবস্থার সকলের চেয়ে অনুৎপাদক বিভাগ–সৈনিক বিভাগ, তাকে সম্পূর্ণরূপে সুদক্ষ রাখার অপব্যয় এদের পক্ষে অনিবার্য। কেননা আধুনিক মহাজনী যুগের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এদের শত্রুপক্ষ।''

এই ছোট বক্তব্যে তখনকার সোভিয়েত রাষ্ট্রের সমস্যা স্পষ্ট। বলতে গেলে অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি। নানাদিক থেকে নব্য রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপট তখন সত্যই মেঘাচ্ছন্ন। গৃহযুদ্ধের ফলে দেখা দিয়েছে প্রচন্ড অর্থনৈতিক সংকট। সেই সঙ্গে খাদ্য ও অন্যান্য সরবরাহ ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। নয়া রাষ্ট্রের উপর বিভিন্নমুখী আঘাতের প্রতিক্রিয়া সামলাতে গিয়ে লেনিন শুধু নয়া অর্থনৈতিক নীতি ('নেপ') প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত হননি। বলা যায় আগেকার সহনশীল তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে সরে এসে সাময়িকভাবে পার্টি–সংহতি, পার্টি শক্তি ও পার্টি–একনায়কত্বের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেলেন; বলা যায় দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। উদ্দেশ্য, পার্টির সংহত শক্তির উপর নির্ভর করে অবস্থা সামাল দেওয়া; বিভিন্ন খাতে শৃংখলা ও কর্মতৎপরতা ফিরিয়ে আনা।

লেনিন, মনে হয়, পার্টি–শক্তি ও সংহতির বিষয়টি আপৎকালীন প্রয়োজন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এর অর্থ, লেনিনকে দায়মুক্ত করার চেষ্টা নয়। তখনকার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ছবি এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয়দের ভূমিকা মনে রাখলে এই সব পদক্ষেপ অস্বাভাবিক মনে হবে না। মনে রাখা দরকার যে, লেনিন–প্রবর্তিত নয়া অর্থনীতির ভিত্তি ছিল মিশ্র অর্থনীতি। বড়বড় শিল্প ও পরিবহন খাত যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব থাকবে তেমিন ছোট, মাঝারি শিল্প থাকবে বেসরকারী খাতে, চলবে প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে।

অন্যদিকে রুশবিপ্লবের ইতিহাস পাঠক ভুলে যাননি যে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ট্রটস্কির মত নেতাও বলেছিলেন, এটা শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র; সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করাই এই সরকারের দায়িত্ব। তাই স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নের কোন প্রয়োজন নেই। ট্রেড ইউনিয়ন রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে একাকার হয়ে যাক। ট্রটস্কি ও তার সহযোগীদের এই দাবির বিরোধিতা করেছিলেন স্বয়ং লেনিন। আর বুখারিনের মত মধ্যপন্থীরা তখন ট্রটস্কির কট্টরপন্থী প্রস্তাবের পক্ষে। অবাক হবার মত ঘটনা যে, স্তালিন সহ বারোজন সহযোগীর সমর্থনের শক্তি নিয়ে লেনিন সেদিন বলেছিলেন সোভিয়েটগুলো এখনও পুরোপুরি সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্র নয়, আমলাতান্ত্রিক প্রভাব এখনও যথেষ্ট।

এ প্রসঙ্গে আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি সেদিন বলেছিলেন যে, শ্রমিক শ্রেণীকে এই নয়া রাষ্ট্রটি যেমন রক্ষা করতে হবে তেমনি স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থও রক্ষা করতে হবে। এমন কি স্বাধীনচেতা শ্রমিক হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দেওয়া না–দেওয়ার অধিকারও তাদের থাকতে হবে। এই লেনিনই কিছুদিন পর সরকারি আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সদাসতর্ক থাকতে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি আহবান

জানিয়েছিলেন। মনে হয়, মাও–য়ের মত দীর্ঘজীবন পেলে তাকেও ক্ষমতার জগদ্দল পাথরের স্থবিরতার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডাক দিতে হোত এবং তার অনেক আচরণেই এই চিন্তাধারা, এধরনের দৃষ্টিভঙ্গির আভাস মেলে। কারণ, লেনিন বরাবর চেয়েছেন পার্টির শুদ্ধ চরিত্রের মানদন্ড বজায় রাখতে, পার্টি–নৈতিকতা অক্ষুন্ন রাখতে।

তাই বুঝতে হবে, এ ধরনের গণতান্ত্রিক চিন্তার, এমনকি একসময় একাধিক পার্টির অস্তিত্ব স্বীকার করার চিন্তা থাকা সত্ত্বেও কেন লেনিনকে এক পার্টি এবং পার্টির একক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার পক্ষে দাঁড়াতে হয়েছিল। এর মূল কারণ, পার্টি তখনও যথেষ্ট পরিমানে জনমানসের মাটিতে শিকড় ছড়াতে পারেনি এবং নৈরাজ্যবাদীদের বিরোধিতায় সোভিয়েট অস্তিত্ব ও রাষ্ট্রকাঠামোর সম্ভাবনা বিপন্ন হয়ে উঠছিলো। তাই একে রক্ষা করতে তাকে হতে হয়েছিল কঠোর। এবং সিন্ডিক্যালিষ্টদের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধেও তাকে তাত্ত্বিক সংগ্রামে নামতে এবং বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল।

দেশ জোড়া অস্থিরতা, অর্থনৈতিক সংকট, ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতার মূলে শক্ত হাতে শাসন যন্ত্রের লাগাম ধরার প্রয়োজনে ১৯২১ সালে লেনিন পার্টির দশম কংগ্রেসে সেই যে পার্টি সংহতি ও পার্টির ক্ষমতা শৃংখলাবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত করার উপর জোর দিলেন, তার মৃত্যুর পর অবস্থার উন্নতি সত্ত্বেও সেদিকে আর কেউ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি। এমন কি ১৯২৩ সালে ট্রটস্কিই ঘোষণা করেন, 'শেষ বিচারে পার্টি সব সময়ই ঠিক। কেননা এটাই সর্বহারাদের হাতে একমাত্র অস্ত্র যা দিয়ে সে তার কর্তব্য সমাধা করতে পারে''।

আর সে বছরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসেই পার্টি–একনায়কত্বের পথ তৈরি হল। অবাক হবার কথা যে, জিনোভিয়েভের মত নরমপন্থী নেতাও দৃঢ়কণ্ঠে পার্টি–একনায়কত্বের পক্ষে মতামত প্রকাশ করে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব ও পার্টি–একাকার করে দেবার পথ তৈরিতে হাত লাগালেন। আজকে অবিশ্বাস্য শোনালেও কথাটা সত্য যে, অই দ্বাদশ কংগ্রেসেই জিনোভিয়েভের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন স্তালিন এবং সর্বহারার একনায়কত্ব এবং পার্টি–একনায়কত্ব দুটো ভিন্ন বিষয়, এই মতামতই প্রকাশ করেন। তা সত্ত্বেও তখন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতই গ্রহণ করা হয় এবং লেনিন তখন গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী। এমনি করে আপৎকালের দাবি মিটাতে গিয়ে পার্টি, বিশেষ করে পার্টি–নেতৃত্ব সেই যে একেশ্বর হয়ে উঠল, সেই ধারার আর অবসান ঘটেনি। বরং দিনে দিনে সে ক্রমেই শক্তিমান হয়ে উঠেছে। তার শক্তির বিস্তার ঘটেছে। স্তালিন আমল থেকে ডালপালা মেলে পার্টি–নেতৃত্বের ধাপে ধাপে শক্তির বিস্তার এবং মূল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত একটি বিন্দুতে, পার্টি সম্পাদক এবং তার সমর্থক পোলিট বুরোতে। ক্রমে সেটা হয়ে উঠল শক্তির এক রক্তমাংসহীন যন্ত্র।

এই অবস্থা থেকে পার্টি আমলাতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থার উদ্ভব, বিস্তার ও ব্যাপকতা অর্জন। বড়-মাঝারি–ছোট পার্টি নেতা মানেই শক্তিধর, স্বত্বভোগী, সুবিধাভোগী।

পার্টির কেন্দ্রীয় মস্তিষ্ক হয়ে উঠল এমন এক যান্ত্রিক ব্যবস্থা, আধুনিক ভাষায় বলা যেতে পারে উদ্ভট 'কম্পিউটার' যেখান থেকে শুধু নির্দেশই বেরিয়ে আসে; কিন্তু প্রান্তিক অবস্থান, জনঅবস্থান থেকে তথ্যাদি এসে কম্পিউটারকে সমৃদ্ধ করবেনা, অর্থাৎ একমুখী কম্পিউটার– যেখানে 'ড্যাটা ফিডিং' অনুপস্থিত। এ ব্যবস্থা স্বাভাবিক নয়। 'ফীডব্যাক' ব্যবস্থা মানব মস্তিষ্ক কেন্দ্রের ক্রিয়াকলাপের জন্যেও অপরিহার্য, রাজনীতি এর ব্যতিক্রম নয়। 'ফিড ব্যাকের' অভাবে পার্টি হয়ে উঠল একমুখী অন্ধযন্ত্র।

সোভিয়েত পার্টি এমনি করে এক আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। সম্ভবতঃ অন্যরাও বড় একটা ব্যতিক্রম নয়। এর ফলে জনবিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে, আদান প্রদানের যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে। সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে অপরিহার্য কর্মকান্ডের পরিচালনায় সর্বহারা শ্রেণীর ভূমিকা ক্রমেই গৌণ হয়ে উঠেছে, একসময় একেবারে অনুপস্থিত। পার্টি ও রাষ্ট্রযন্ত্র একাকার হয়ে গিয়ে পার্টি–প্রধান ও পার্টি–নেতৃত্বের হাতে জমা করেছে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকার, যে–ক্ষমতার সঙ্গে জনগণের তো বটেই, সর্বহারা শ্রেণীরও নাড়ির যোগ ছিল না। এ অবস্থা কখনও স্থায়ী হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আবারও বিচক্ষণ রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি, যিনি শ্রেণীসংগ্রামের গূঢ়তত্ত্বে পন্ডিত না হয়েও নিতান্তই সহজাত ক্ষমতায় বুঝে নিয়েছিলেন যে, ''দেশের সৌভাগ্য সৃষ্টির–ব্যাপারে জনগণের চিত্ত সম্মিলিত হলে তবে সেটার ক্রিয়া সজীব ও স্থায়ী হয়।''

কথাগুলো রবীন্দ্রনাথ যে–অর্থেই বলে থাকুন না কেন, সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণের জন্য একথা সত্য। কিন্তু সোভিয়েত পার্টি ও রাষ্ট্র যন্ত্রে এই নীতির প্রয়োগ সামান্যই দেখা গেছে, বিশেষ করে পার্টি–সম্পাদকের হাতে অপরিমিত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার পর থেকে। এই ভুলের দায় একা স্তালিনের নয়, যেমনটি বলা হয়ে থাকে। দায় গোটা প্রক্রিয়ার, যা সংশোধনের জন্য লেনিন বেঁচে ছিলেন না। তার অকাল–মৃত্যু সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে অপরিমেয় ক্ষতির কারণ হয়ে রয়েছে।

আসলে পার্টির একচ্ছত্র আধিপত্য ও এককেন্দ্রিক ক্ষমতা এবং পার্টি–আমলাতন্ত্রের উদ্ভব ও বিস্তারই সেই ঘুণপোকা, যা সোভিয়েত সর্বহারা বিপ্লবের প্রাথমিক সাফল্য ও সম্ভাব্য সুফল কুরে কুরে খেয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর চকচকে বহিরাঙ্গটাই ধরে রেখেছিল, ভেতরে পুষ্টিদায়ক ও শক্তিদায়ক মজ্জাকোষের কোন অবশিষ্ট ছিলনা। উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনায় শ্রমিক নেতৃত্বের বদলে মূর্তিমান প্রধান হয়ে উঠেছিল পার্টি–আমলা ও সংশ্লিষ্ট অহমী ব্যক্তিগণ। তারাই পরিচালক, তারাই অলস সুবিধাভোগী শ্রেণী গড়ে তুলেছে। ক্ষমতার স্থানান্তর এক সুবিধাভোগী শ্রেণী থেকে আরেক সুবিধাবাদী শ্রেণীতে।

এর ফলে উৎপাদনের চাকায় মরচে ধরেছে, উৎপাদনের গুণগতমান নষ্ট হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিমাণগত মানও। সমালোচনার অভাব যেমন সমাজতান্ত্রিক কর্মকান্ডের গতি শ্লথ ও মান নিম্নমুখী করেছে, তেমনি যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার

সঠিক ব্যবহার সংগঠন-কাঠামোর স্বাস্থ্য, সজীবতা ও গতিময়তার পূর্বশর্ত, তার অভাব কিংবা সীমাবদ্ধ বৃত্তে অবস্থানের কারণে তা হয়ে দাঁড়ালো আমলাতান্ত্রিকতা বিকাশের সহায়ক শক্তি।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র চর্চার অভাব তাই বিপ্লবের প্রকৃত লক্ষ্যকেই বিপথগামী করেনি, বরং সর্বহারা শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে অবাধ গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে বিকশিত করে শাসনযন্ত্রের স্ক্রু-নাট-বল্টুতে পরিণত করা এবং উৎপাদনের চাকা গতিশীল করে তোলার কাজে বাধাই সৃষ্টি করেছে। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেনীর নয়, বরং সংখ্যালঘু শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে রুশপার্টি আপন বিস্তার ও বিকাশ বন্ধ করে ফেলে সুবিধাবাদী ঘুণপোকার আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। একে সর্বহারার একনায়কত্ব বলা চলে না; সর্বহারার প্রতিনিধিত্বকারী অগ্রগামী পার্টিও বলা চলেনা।

এখানে শ্রমিক-কৃষকের সংহত ঐক্য এবং কার্যকরী ভূমিকা গুরুত্বও আমাদের বিবেচনায় আনা দরকার। এই ঐক্যের গুরুত্ব সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার বিকাশ ও সংরক্ষণে অপরিসীম। মৃত্যুর কিছুকাল আগে ১৯২২ সালে ২৫ ডিসেম্বর এক প্রতিবেদনে লেনিন এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে লিখেছিলেনঃ

'আমাদের পার্টি দুইটি শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল-কৃষক ও শ্রমিক; এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সমঝোতা না থাকলে পতন অনিবার্য।'

পতন পার্টির, না রাষ্ট্রের সে সম্পর্কে লেনিন উচ্চবাচ্য না করলেও বুঝতে কষ্ট হয়না যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দুই শ্রেণীর সচেতন অংশগ্রহণ করা ছাড়া সমাজতন্ত্রের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো যাবে না; সেকথা লেনিন ভালোই বুঝতেন এবং তার একাধিক লেখায় তেমন প্রমাণ মেলে। কিন্তু লেনিনের অবর্তমানে সোভিয়েত-পার্টির নেতৃত্ব এই সত্য অনুধাবন করেছে বলে মনে হয়না।

আর করেনি বলেই উল্লিখিত ঐক্য আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি এবং এই কীটনাশকের অভাব ঘুণপোকার অবাধ বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করেছে; রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে সমাজকাঠামোয়। সোভিয়েত পার্টি নির্বিবাদে ও নির্বিচারে তার সংগঠন কাঠামোয় এই সর্বনাশ ঘটতে দিয়েছে। ডান বিচ্ছিন্নতার এই বিষয়টি আজ এতকালের পর সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনে উল্লসিত আমাদের জনৈক বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী বেশ বড় গলায় বলতে পেরেছেন যে, 'অস্বাভাবিক চাপাচাপি সত্ত্বেও তার দেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষকেও পার্টির সদস্যভূক্ত করতে পারেনি।' কথাগুলোর গুরুত্ব অস্বীকারের উপায় নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন মার্কসবাদী হয়তো রুশবিপ্লব ও তার সমাজতান্ত্রিক নীতিমালার বিশেষ দিক সম্পর্কে রোজা লুক্সেমবার্গের সমালোচনা বেদনার সঙ্গে স্মরণ করবেন। রোজা চেয়েছিলেন সোভিয়েত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংগঠনে গণতন্ত্রের

চর্চা, শ্রমিক সংগঠনের স্বাধীনতা ইত্যাদি অধিকার, যা তার মতে পার্টি আমলাতন্ত্র বিকাশের পরিবর্তে সর্বহারার নেতৃত্ব বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে। রুশ পার্টি এই পথ অনুসরণ করেনি। বরং সোভিয়েত শাসন শ্রমিক সংগঠনের অধিকার ও স্বাধীনতা ক্রমেই কেড়ে নিয়েছে, রুদ্ধ করে দিয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেনীর গণতান্ত্রিক বিকাশ, যে-বিকাশ সর্বহারা শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠার পথ ধরে তাদের স্বাভাবিক নেতৃত্বের প্রক্রিয়াও বাস্তবায়িত করতে পারতো।। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি।

একটি বিপ্লবী পার্টিতে যদি গণতন্ত্রের চর্চা স্থান না পায়, তবে সে পার্টি কেমন করে সর্বহারা শ্রেণীর লক্ষকোটি মানুষকে নয়া পরিচালনা ব্যবস্থার ছোটবড় নানা গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রে পরিণত করবে? সেক্ষেত্রে পার্টি হয়ে উঠতে পারে অতিশয় লঘুসংখ্যকের দ্বারা তৈরি একস্থবির যন্ত্র, যেখানে আমলাতন্ত্র ও এর নানা বুর্জোয়া উপাদান ক্রমশঃ ঠাঁই পেতে থাকে। এমন পার্টি সংখ্যাগরিষ্ট শ্রেণীর প্রতিনিধি না হয়ে তাদের চালকে পরিণত হয়, যা মার্কসবাদী চিন্তাভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীত।

এই একদেশদর্শিতা ও আমলাতান্ত্রিক চরিত্র একদিকে উৎপাদনের পরিমান মাত্রায় পৌছাতে জনগণের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে, গুণগত মানের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি। জনগণের চাহিদা পূরণও তাদের দায়িত্বে অঙ্গীভূত ছিলনা। সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পথ খোলা না থাকায়, ব্যক্তিস্বার্থ ও পার্টিস্বার্থ রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সঙ্গে একাকার হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ- তথা শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। এই পার্টি-জনবিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে জনসমর্থনের পোষক রসে বঞ্চিত পার্টিতন্ত্রের উপর ভর দিয়ে রাষ্ট্রতন্ত্র যদ্দিন সম্ভব মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, রয়েছে ঘুনেধরা সমাজব্যবস্থা। ঘুণে-খাওয়া পার্টিতন্ত্র ভেঙ্গে ফেলার কারণে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়েছে। পার্টি একনায়কত্বের বদলে শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে পার্টির ভাঙ্গনে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটতো না। শ্রমিক-কৃষক ও তাদের সমর্থক শ্রেণী সমাজব্যবস্থার পতন রুখে দিতে পারতো। পার্টি, শ্রেণী ও রাষ্ট্র একাকার হয়ে যাবার এই হল ফলাফল।

চীনে মাও-সে-তুং পার্টি ও রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের ঘুণপোকার বিস্তার ও প্রভাব রোধ করতে স্থবির 'হেডকোয়ার্টার' ভেঙ্গে ফেলার আহবান জানিয়েছিলেন এবং পার্টির মতাদর্শ সম্পন্ন তরুন ও যৌবশক্তিকে এই কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। নীতিগতভাবে সঠিক হলেও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অই কাজ মোটেই সহজ ছিলনা। তাই মাওয়ের দৈহিক জরা ও লাগাম ধরে রাখার অক্ষমতার কারণে গোটা প্রচেষ্টা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। (তুলনা চলেনা, তবু ফরাসি বিপ্লবের আতিশয্যের কথা মনে এসে যায়) সম্ভব হয়নি আমলাতান্ত্রিক ও একদেশদর্শী প্রভাব কাটিয়ে সর্বহারা শ্রেণীকে রাষ্ট্রযন্ত্রের ও সমাজ

পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে বসিয়ে দেওয়া। তাই সাংস্কৃতিক বিপ্লব চীনা রাজনীতির ইতিহাসে 'হঠকারি অধ্যায়' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

এই কাজটি স্তালিন করতে পারতেন। রুশবিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করতে গিয়ে তার হাতে ইতিবাচক অর্জনের পাশাপাশি নেতির ভাগও কম নয়। ব্যক্তিগত প্রতিপক্ষ অপসারণের মানসিক প্রবণতায় আক্রান্ত না হলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝড়ো হাওয়ার সাহায্যে অনেক অপরিণত ও ঝরাপাতা উড়িয়ে দিয়ে পরিচ্ছন্ন আঙ্গিনায় নতুন সৃষ্টি আয়োজন শুরু করতে পারতেন।

এতসব তো গেল তত্ত্বগত দিক। কিন্তু প্রায়োগিক দিকে ঘটেছে আরো গুরুতর গলদ। অনুৎপাদী ও অসৃজনশীল খাতে অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ মার্কসবাদী জনচাহিদা পূরণের নীতির সঙ্গে খাপ খায় না। তাতে সাম্রাজ্যবাদী ঝোঁক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরবর্তীকালীন ভূমিকা তাই প্রমাণ করে। এমন কি স্তালিন আমলের পূর্ব ইউরোপও তার প্রমাণ। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য।

স্তালিন আমলে পশ্চাদপদ রাশিয়ায় ভারী শিল্পের বিকাশ ঘটেছে আশ্চর্য গতিতে। অবশ্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অনেক পরে। কৃষিতে যৌথ খামার উৎপাদন–ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু এক্ষেত্রে যে অভিযোগ আসে তা হল যে, উৎপাদন পদ্ধতির সমষ্টিগত চরিত্র সত্ত্বেও শক্তি প্রয়োগের সাহায্যে পরিবর্তন কতটা মার্কসীয় নীতি সম্মত? তাতে সর্বহারার স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণই বা কতটা বাস্তব ঘটনা, নেতৃত্বের প্রশ্ন তো দূরের কথা। তাই স্তালিনামলে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের অনুপস্থিতির হার বা কাজ ছেড়ে যাওয়ার ক্রমবর্ধমান ঘটনা সামাল দিতে আইন প্রয়োগ থেকে শুরু করে তাদের অধিকার কেড়ে নেবার পদক্ষেপও রাষ্ট্রকে নিতে হচ্ছিল। একে উৎপাদকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বলেনা বরং নিয়ন্ত্রন পুরোপুরিই ন্যস্ত হয়েছিল পার্টির আমলা ব্যবস্থাপকদের হাতে। কৃষিক্ষেত্রে ছিল একই অবস্থা। এর অর্থ, সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড ও উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ নীচ থেকে নয়, উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার নীতিতেই অনুসৃত হচ্ছিল। এর চরিত্র সমাজতান্ত্রিক নয়।

এর পাশাপাশি সমরাস্ত্র শিল্পে অগ্রগতি ব্যাপক অনেকটা আধুনিকায়ন ও নগরায়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে রাশিয়ার উন্নত প্রযুক্তির শিল্পকারখানার উৎপাদন দক্ষতা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতই; মহাকাশ বিজ্ঞানের ও বিচিত্র আণবিক অস্ত্রসম্ভার গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও দক্ষতা ছিল একই রকম। কয়েক বছর আগে সমরাস্ত্র মূল্যায়নের অতি টেকনিক্যাল এক ব্রিটিশ প্রতিবেদনে উদ্বেগের সঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, সোভিয়েত–নৌ–প্রযুক্তি ও সমরশক্তি পশ্চিমা শক্তির তুলনায় কয়েক পা এগিয়ে রয়েছে।

অথচ এরই পাশাপাশি ভোগ্যপণ্য শিল্প ছিল যেমন অপরিণত তেমনি অনাধুনিক। দক্ষতার সব অভাব এই খাতটিকে ঘিরে রেখেছিল। যেমন পরিমানগত তেমনি গুণগত উৎকর্ষের দিক থেকে। বাকী ইউরোপ ও আমেরিকানদের তুলনায় এদিক থেকে

অনেক পিছিয়ে ছিল এরা। শিক্ষায় অগ্রগামী মানুষ যখন নিজেদের উন্নত প্রযুক্তির অন্তর্গত পরাশক্তি হিসাবে চিহ্নিত হতে দেখে তখন ভোগ্যপণ্যের মধ্যযুগীয় অবস্থার জন্য সমাজতান্ত্রিক বিনির্মানকেই দায়ী করতে থাকে; ক্ষোভ ও ক্রোধের সীমা থাকে না। মতাদর্শের আহ্বান, সমষ্টিগত চেতনা ইত্যাদি শব্দ অর্থহীন হয়ে ওঠে।

সবচেয়ে দুরবস্থা ছিল কৃষিখাতে। স্তালিনের জীবদ্দশার শেষ দিক থেকেই কৃষিপণ্যের এই হতদশা। ১৯১৩ সালে যেখানে মোট কৃষিপণ্যের উৎপাদন ৮৬ মিলিয়ন টন, ১৯৪০-এর সেই পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৫ মিলিয়ান টন, আর স্তালিনের শেষ চার বছরে গড় পরিমান হল বছরে ৮০ মিলিয়ন টন। সরকারী ভর্তুকিতে সামাল দেওয়া যাচ্ছিল না। খামারগুলো জনশক্তি, যন্ত্রপাতি, সার, ট্রাক্টর পরিবহন ইত্যাদি নানা দিক থেকে অবহেলিত। পার্টি নেতৃত্বের এদিকে নজর ছিলনা। স্তালিনের যুগে এই অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে একই হারে, বরং বলা আরো দ্রুতগতিতে। ইতোমধ্যে পার্টি আমলাতান্ত্রিক চেতনায় বুর্জোয়া আদর্শের উপাদান প্রভাব ফেলেছে যথেষ্ট। অন্যদিকে উগ্ররুশী জাতীয়তাবাদী চিন্তা ইউরোপ ও এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্যে পরিণত। এই বিদেশনীতি অর্থনীতিতে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে নিশ্চিত হারে; পরাশক্তির গর্ব সেদিকে নজর দেয়নি, নজর দেয়নি জনস্বার্থের দিকেও। এই সব দুর্বলতা আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী বিশ্লেষণে কোথাও কোথাও চিহ্নিত করা সত্ত্বেও প্রখর অবহেলায় সেসব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। নেতৃত্ব ভেবে দেখেনি যে, অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ থাকেনা; তার প্রক্রিয়া শুরু হবেই এবং এক সময় ধ্বস নামবেই। অন্ধ না হলে কি নিজের খেতখামার অবহেলায় ফেলে রেখে মহাকাশ অভিযানের মাশুল তুলতে হয় বিদেশ থেকে বছরের পর বছর খাদ্য আমদানি করে এবং সত্ত্বেও বোধোদয় ঘটে না?

এই দীর্ঘ সময়ে এক শ্রেণীর পার্টি নেতৃত্বে যে-পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী আদর্শের প্রবণতা গড়ে উঠেছিল, সেই অতি সংখ্যালঘু শ্রেণীর স্বার্থ নিয়েই সোভিয়েত পার্টি ক্ষমতায় টিকে ছিল। তাদেরই শেষ প্রতিনিধি গর্বাচেভ এবং নয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তথা বাজার অর্থনীতির নবীন প্রবক্তা ইয়েলৎসিন। সমাজতন্ত্রের নিরিখে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনস্বার্থ তথা সর্বহারার স্বার্থ চুলোয় যাক, কোন মতে পশ্চিমা সাহায্য নিয়ে বিত্তবানের স্বার্থে এবং সেই শ্রেণী গড়ে তুলতে পারলেই হয়। এদের হাতেই শুধু নয়, এদের পুর্বসুরিদের অন্ধ ও ভ্রান্তনীতির তরবারিতে কাটা পড়েছে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিনির্মান। এই অর্থে রুশবিপ্লব এদের হাতে সাময়িকভাবে হলেও পরাজিত হয়েছে। একাজে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ষড়যন্ত্র, প্রচার, কূটনীতি ও অর্থনীতি সহায়ক শক্তি মাত্র।

সব শেষের সংক্ষিপ্ত কথা হল, সোভিয়েত ইউনিয়নে দীর্ঘদিন ধরে পার্টি আমলাতন্ত্রের একদেশদর্শী নীতি, সর্বহারা একনায়কত্বের বদলে পার্টি একনায়কত্বের অবাঞ্ছিত কর্মকাণ্ড, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণ থেকে পিছিয়ে-পড়া, পার্টির জন-বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও তার অভিভাবক সুলভ মনোভাব, শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াসের অভাব, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ব্যবহারিক অনুপস্থিতি,

বিদেশনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব, পার্টিতে সুবিধাভোগী চিন্তার প্রাধান্য এবং অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উপাদানের প্রভাব, জনমানসের চাহিদার প্রতি চরম অবহেলা ইত্যাদি নানা অঘটনমূলক ঘটনার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের পথ চলার ক্ষেত্রে নীতিগত ও প্রয়োগগত যেসব ভুলভ্রান্তি ঘটেছে তারই অবশেষ পরিণাম হিসাবে বুর্জোয়াতন্ত্রে আসক্ত পার্টি নেতৃত্বের হাত দিয়ে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়। অবশ্য সেক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী কূটকৌশল এবং তাদের প্রচ্ছন্ন হস্তক্ষেপও অনস্বীকার্য।

তবে এই সঙ্গে আরো যুক্ত হয়েছিল পার্টির অদূরদর্শী ভ্রান্তনীতির ফলে আধুনিক প্রযুক্তির উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার না করার এবং সামাজিক চাহিদামাফিক উৎকৃষ্টমান পণ্য উৎপাদনে চরম অবহেলার পরিনাম। আপন অর্থনৈতিক ক্ষমতার পরিমাপ না করে সিংহভাগ শক্তি নানা অনুৎপাদনী খাতে অপব্যয়ের ভ্রান্তিও কম দায়ী নয়। এইসব মিলে নড়বড় 'তাসের ঘর' অর্থনীতি তৈরি হয়েছিল, যা সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতি ও ষড়যন্ত্রের ধাক্কা সামলাতে পারেনি।

আমরা মনে করি সোভিয়েত রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের এ বিপর্যয় অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের পার্টিগুলোকে এই প্রেক্ষাপটে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক অবস্থান নিতে সাহায্য করতে পারে। তেমনি পারে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে লড়াইরত তৃতীয় বিশ্বের পার্টিগুলোকে। এটাই এই বিপর্যয়ের শিক্ষণীয় দিক। এবার তারা ভাবতে শিখবেন যে, কম্যুনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় গেলেই যে রাষ্ট্র সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্র হয়ে উঠবে এমন কথা ঠিক নয়। পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রের বদলে নতুন সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কোন কাগজে বিষয় নয়। সমাজে নতুন শ্রেণী-সম্পর্ক, উৎপাদান-সম্পর্ক ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষমতা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগহণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সত্যকার সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। জনপ্রতিষ্ঠান এবং জনগনের সজীব ও সক্রিয় কর্মকান্ডের গতিময়তা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিনির্মান থাকতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে সম্বল করে এই যাত্রা শুরু।

স্বভাবতঃই বর্তমান বিপর্যয়ে মার্কসবাদী সংগঠন ও কর্মীদের হতাশ হবার কিছু নেই। বরং এই অঘটন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারাটাই হবে লাভজনক ঘটনা। তবে বিশ্বের প্রথম সমাজতন্ত্রী দেশটিকে বড়ো রকমের মাশুল গুণতে হলো, এই যা।

রচনাকাল ঃ ১০ আশ্বিন, ১৩৯৮।

পরিশোধিতঃ

সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

বদরুদ্দীন উমর

সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা এখন সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক বিশ্বব্যাপী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টরা, বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষাকারী এই প্রচারণার সাথে তাল মিলিয়ে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচারকার্য অব্যাহত রেখেছে। এই প্রচার-প্রচারণার মুল বক্তব্য হলঃ একটি সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্রের কোনো গ্রাহ্যতা এবং কার্যকারিতা আর নেই, বিশেষ এক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব আর বিকাশ হলেও একটি সমাজব্যবস্থা হিসাবে তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে ভাঙন এসেছে এবং সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলতে যা-কিছু বোঝায়, তার অবসান ঘটেছে। সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইউরোপীয় কয়েকটি দেশে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে তার প্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই বুর্জোয়া প্রচারণা যে পর্যায়ে গেছে এবং যে আকারে হচ্ছে তার কোনো পূর্বদৃষ্টান্ত নেই।

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের সময় থেকেই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার-প্রচারণা একটানা চলে এলেও, তখন রাশিয়ায় এবং পূর্ব-ইউরোপ, চীন ইত্যাদি দেশে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিও একটানাভাবে জারি থাকার ফলে তাদের প্রচারণার ধার অনেক ভোতা এবং প্রভাব যথেষ্ট সীমিত ছিল। কিন্তু ১৯৮৭ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং ১৯৮৭ সালে পূর্ব-ইউরোপে যেসব পরিবর্তন দ্রুত সাধিত হয়েছে, সেই প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণার প্রভাব এবং সেই প্রচারের দ্বারা সৃষ্ট বিভ্রান্তি এখন আগের যে-কোনো সময়ের থেকে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, এই প্রচারণার ফলে সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে, এমনকি প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যেও যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে তারও কোনো পূর্বদৃষ্টান্ত নেই।

এই হতাশার কারণ একদিকে ধনতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, শাসন এবং নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং প্রবল তাগিদ, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগেকার নিশ্চিত ধারণার পরিবর্তে সন্দেহ, এমনকি সমাজতন্ত্রের কার্যকারিতার ব্যাপারে পরিপূর্ণ অবিশ্বাস। এই সন্দেহ আর অবিশ্বাসের প্রকৃত কোনো ভিত্তি না থাকলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের, পূর্ব-ইউরোপ আর চীনের

সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ এবং পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাম্রাজ্যবাদী প্রচার মাধ্যমগুলির দ্বারা যেভাবে পরিবেশিত হচ্ছে এবং তার পাল্টা প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাধ্যমসমূহ যেভাবে অনুপস্থিত রয়েছে, তার ফলে জনগণের মধ্যে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে উল্লিখিত বিভ্রান্তি খুবই স্বাভাবিক।

..........মার্কস বলেছিলেন ঃ উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত সংকট পরিপক্ক হওয়া, সংকট নিরসনের কোনো পথ খোলা না থাকা এবং প্রোলেতারিয়েত একটি সুসংগঠিত, তাত্ত্বিকভাবে সুসজ্জিত, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও বন্টন-সম্পর্ককে উৎখাত করার মতো অবস্থায় উপনীত হওয়ার পরিস্থিতিতেই ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপ্লব সংঘটিত হবে। মার্কসের এই ভবিষ্যদ্বাণী ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব, ১৯৪৪-৪৫ সালে পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলিতে বিপ্লব, ১৯৪৯ সালে চীন বিপ্লব ইত্যাদির ফলে মিথ্যা প্রমাণিত হয় নি। উন্নত ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঠিক সেইভাবেই ঘটবে যেভাবে মার্কস বলেছিলেন। কিন্তু তার পূর্বে অনুন্নত কিছু দেশে ইতিমধ্যে বিপ্লব সংঘটিত হওয়া এবং অন্যকিছু দেশে সেই ধরনের বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে থাকা যে ঐতিহাসিক নিয়ম অনুযায়ী সম্ভব হয়েছে আর হচ্ছে, সেগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং সুত্রায়ণ মার্কসবাদী বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুযায়ীই সম্ভব।

লেনিন ঠিক তা-ই করেছিলেন। পশ্চাৎপদ দেশে, রাশিয়ার মতো দেশে, জার্মানীর আগে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণের শৃঙ্খল যেখানে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে, সেখানেই সৃষ্টি হয় বৈপ্লবিক পরিস্থিতি এবং সম্ভাবনা দেখা দেয় বিপ্লব বাস্তবে সংঘটিত হওয়ার।

১৯১৭ সালে যে-রাশিয়ায় বিপ্লব হয়েছিল সেটি ছিল একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল সাম্রাজ্যবাদী দেশ; কিন্তু তা সত্ত্বেও রুশ সমাজ তখন প্রায় সবদিক থেকে ছিল ভয়ানক পশ্চাৎপদ। তাদেরকে অনিবার্যভাবে ধনতন্ত্রের কতকগুলি অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে হয়, সেগুলি না করে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কাজ যথাযথ শুরু করা বা তার ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব হয় নি। এসব কাজের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, উৎপাদনের সামাজিকীকরণ। ঐতিহাসিকভাবে ধনতন্ত্রই উৎপাদনের সামাজিকীকরণ করে থাকে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দাঁড়ায় একটি বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে উৎপাদনের সামাজিকীকরণের এই প্রয়োজনীয়তার দিকটি বিবেচনা করেই মার্কস ধনতন্ত্রের বিশ্লেষণ করে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলেছিলেন। কারণ, ধনতান্ত্রিক সামাজিক উৎপাদন এবং উৎপাদন উপকরণের উপর

ব্যক্তিগত মালিকানার মধ্যে যে ব্যবস্থাগত অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব–সংকটের সৃষ্টি হয়, তার কোন চূড়ান্ত মীমাংসা ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে সম্ভব হয় না–যদিও ধনতন্ত্র সাময়িকভাবে এই সংকট উত্তীর্ণ হয়ে নিজের অস্তিত্বকে কিছুদিন টিকিয়ে রাখতে এবং নিজের অনিবার্য ধ্বংসকে বিলম্বিত করতে পারে।

যে–রাশিয়ার বিপ্লব ঘটেছিল সেটি যে শুধু একটি পশ্চাৎপদ দেশ ছিল তাই নয়, বিপ্লবের পর নতুন রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘেরাও এবং আক্রান্ত হয়েছিল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা। এই দুই পরিস্থিতি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক নিয়মাবলীর আবির্ভাবকে কিভাবে পদে–পদে ব্যাহত করেছিল, ধনতান্ত্রিক নিয়মকানুন ও প্রক্রিয়া কিভাবে সমাজতান্ত্রিক নিয়মকানুন ও প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে সেখানে নতুনভাবে কিছু ধনতান্ত্রিক ধ্যানধারণা, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নিয়মাবলীর প্রত্যাবর্তন ও সংশোধনবাদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল সেটি বুঝতে সক্ষম হলে সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব–ইউরোপের দেশগুলিতে এবং চীনেও যেসব পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে, সেগুলির প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা সহজ হবে এবং সেই সঙ্গে বোঝা যাবে যে, কোনো বিশেষ দেশ বা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এককালীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাময়িক ব্যর্থতার অর্থ ঐতিহাসিক এক বিশ্ব ব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা অথবা তার সম্ভাবনার বিনাশ নয়।

কোন পশ্চাৎপদ দেশে কমিউনিষ্ট পার্টি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার পর সেখানে উৎপাদনের বিকাশ ঘটাতে গিয়ে উৎপাদনের যে সামাজিকীকরণ ঘটায়, সেটা যে ইতিপূর্বে ঐতিহাসিকভাবে ধনতন্ত্রই সম্পন্ন করেছে, একথা আগেই বলা হয়েছে। প্রাক–ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মালিকানার আকার খুব বড়ো হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদনের ক্ষেত্র হত ক্ষুদ্র। একজন জমি মালিকের লক্ষ একর জমি থাকলেও তার জমিতে যারা চাষাবাদ করত তারা ছোট–ছোটো খন্ড–খন্ড জমিতে পৃথকভাবেই তা করত। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বিভিন্ন শিল্পসামগ্রীও সেইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত উৎপাদকদের দ্বারা তৈরি হতো। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মালিকানার আকার ছোটো না হলেও উৎপাদনের এই পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে সেখানে যৌথ সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে উৎপাদনের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া জারি করা হলেও সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার সময়ে এমন কতগুলি নিয়মের আর্বিভাব হয় এবং সেইসব নিয়মের বশবর্তী হয়ে এমন কতকগুলি অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি পদক্ষেপ নিতে হয়, যার মধ্যে কিছু ধনতান্ত্রিক উপাদান অবশ্যম্ভাবীরূপে বিরাজমান থাকে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ আগেই বলা হয়েছে যে, ঐতিহাসিকভাবে সমাজতন্ত্র এমন এক পর্যায়ের উৎপাদন ও সমাজব্যবস্থা, যে পর্যায়ে উৎপাদনের সামজিকীকরণের কাজটি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। কাজেই এই ''আদর্শ'' ঐতিহাসিক পরিস্থিতির

অনুপস্থিতিতে উৎপাদনের সামাজিকীকরণ শুরু করে তাকে দ্রুত সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ–কাজের দিক পরিচালনা করতে গিয়ে যেসব নিয়মগত জটিলতা এবং একাধিক ব্যবস্থার নিয়মাবলীর সংমিশ্রণ ও পারস্পরিক প্রভাব বিস্তার ঘটে তার ফলে সমাজতান্ত্রিক নিয়মাবলীর স্বাভাবিক ও মসৃণ বিকাশ সম্ভব হয় না। তার মধ্যে অনেক ধনতান্ত্রিক বিকৃতিও অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়, যে বিকৃতির উপর কোনো ব্যক্তি বিশেষের হাত থাকে না, যা হয় সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির ইচ্ছা–নিরপেক্ষ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে বিপ্লবের বাস্তব পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে–কৃষি উৎপাদনের সামাজিকীকরণ পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন হলেও এদিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। উভয় ক্ষেত্রেই, ভিন্নভাবে হলেও ধনতান্ত্রিক ধ্যানধারণার কিছু প্রভাব এমনভাবে বিদ্যমান ছিল যা পরবর্তী কালে সংশোধনবাদ ও ধনতান্ত্রিক শক্তি জোরদার হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় খামার আর সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের সামাজিকীকরণের জন্য যে সব পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল, সেগুলি রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের যথেষ্ট ও প্রয়োজনীয় বিকাশের পর বিপ্লব সংঘটিত হলে নেওয়ার দরকার হত না। কারণ তখন উৎপাদনের সামাজিকীকরণ আগেই হয়ে থাকত এবং তার ভিত্তির উপর সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ–কাজ অনেক বেশি সহজ হত এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়মাবলীও তুলনামুলকভাবে অনেক স্বাভাবিক অবস্থায় আবির্ভূত আর বিকশিত হতে পারত। চীনে কৃষি–উৎপাদনের সামাজিকীকরণ, পারস্পরিক সাহায্য, সমিতি, সমবায় সমিতি ও কমিউন–পদ্ধতির মাধ্যমে হলেও সেখানে এক পর্যায়ে উপস্থিত হয়ে, কৃষি–অর্থনীতির পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ধনতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয় এবং অনেকখানি সামাজিকীকরণ সত্ত্বেও তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে ধনতান্ত্রিক ধ্যানধারণা, ব্যক্তিগত হিসেব নিকেশের ব্যাপারকে যেভাবে প্রশ্রয় দিতে হয় তার ফলে সমাজতান্ত্রিক নিয়মকানুনের অধিকতর বিকাশ এবং উন্নততর আবির্ভাব বাধাগ্রস্ত হয়। শুধু তাই নয়, সেই পর্যায় থেকে, সাময়িকভাবে হলেও সেখানে এক উলটো যাত্রা শুরু হয়, যার প্রথম প্রবল বহিঃপ্রকাশ ঘটে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে এবং পরবর্তী কালে মাওয়ের মৃত্যুর পর, ধনতান্ত্রিক প্রভাব যেখানে খুব ধরনের কোনো ওলটপালট ছাড়াই প্রাধান্যে আসে।

বিপ্লবের পর কিভাবে ধনতান্ত্রিক প্রভাব সমাজতান্ত্রিক নিয়ম তথা ব্যবস্থার আবির্ভাব ও বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে এবং একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ধনতান্ত্রিক জটিলতা আর বিকৃতির সৃষ্টি করে, সেটা আরও স্পষ্টভাবে দেখা যায় অন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে। এবং এসব ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি এই জটিলতা আর বিকৃতির জন্মদান করে, সেটা সৃষ্টি হয় বিপ্লবোত্তর একটি সমাজ ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকা এবং সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক তার উপর নানাভাবে আক্রমণ পরিচালনা করা এবং অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার ফলে।

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পরবর্তী পরিস্থিতির দিকে তাকালে এ বিষয়টি কিছুটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। ধনতান্ত্রিক এবং সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থ এবং সেই সাথে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিপ্লবের মাধ্যমে উৎখাত করা হলেও এইসব উৎসাদিত স্বার্থ বিপ্লবোত্তর পর্যায়েও যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। এজন্য তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর বাইরের থেকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এবং ভিতর থেকে তার বিরুদ্ধে পরাজিত শত্রুদের অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা–দুই–ই অব্যাহত ছিল এবং এই দুই ধরনের তৎপরতার মধ্যে আবার ছিল খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বাইরের আর ভিতরের এইসব শত্রুর আগ্রাসী এবং অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম এবং তৎপরতার মোকাবেলা করার জন্য সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রকে এমন কতকগুলি কাজ করতে হয়েছিল যে কাজগুলি করা কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে দরকার হয় না। যেমন, (ক) গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিষ্ঠা ও গোয়েন্দা তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া, (খ) সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা, তার শক্তি নানাভাবে বৃদ্ধি করতে থাকা, আর সেই সাথে সামরিক খাতে ব্যয়ও বৃদ্ধি করে চলা, (গ) আমলাতন্ত্রকে উত্তরোত্তর খর্ব করে আনা আর উচ্ছেদের দিকে নিয়ে যাবার পরিবর্তে তার শক্তি বজায় থাকা, এমনকি যুদ্ধ–পরিস্থিতিতে সামরিক আর বেসামরিক আমলার্তন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি হওয়া ইত্যাদি।

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকা অবস্থায় এবং সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরীণ এজেন্টদের অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার মুখে সমাজতন্ত্রকে একটি দেশে টিকিয়ে রাখা এবং তার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে উল্লিখিত যে সব সংস্থা আর সংগঠন গড়ে তুলতে হয়েছে এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত যেসব কাজ করতে হয়েছে, সে প্রতিষ্ঠানগুলি মোটেই সমাজতান্ত্রিক সংস্থা–সংগঠন নয়, সমাজতন্ত্রের জন্য তাদের কোনো দরকার নেই, উপরন্তু সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ–কাজ এবং সমাজতান্ত্রিক নিয়মাবলীর উদ্ভব আর বিকাশের ক্ষেত্রে সেগুলি এক বিরাট প্রতিবন্ধক। শুধু তাই নয়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ধনতান্ত্রিক আর সংশোধনবাদী চেতনার বিকাশের বস্তুগত ভিত্তিভূমি হিসেবেই এইসব সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া কার্যকর থাকে।

একটি চুম্বককে কিছু লৌহকণার কাছাকাছি স্থাপন করলে লৌহকণাগুলির যেমন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, লৌহকণাগুলি চুম্বকের অবস্থান অনুযায়ী এক–একভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, ঠিক তেমনি মানবসমাজে এক–একটি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা গঠিত হলে তাকে কেন্দ্র করেও মানুষের অভ্যাস আচরণ, চিন্তাচেতনা এবং কাজকর্মের এক–একটি বিশেষ ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। মানুষ কতকগুলি বিশেষ ও নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন হয়, অথবা সেইসব নিয়মের অধীন হওয়ার প্রবণতা সেখানে সৃষ্টি হয়। ঠিক এ কারণেই গোয়েন্দা বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, সামরিক বাহিনী এবং সামরিক

ব্যয়– এ সবকিছুই শত্রুর আক্রমণের থেকে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলেও এই প্রয়োজনীয় সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার নিয়মাবলী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতর এমনভাবে ক্রিয়াশীল থাকে যাতে সেই পরিস্থিতিতে সেখানে সমাজতন্ত্রের নিজস্ব নিয়মাবলী উদ্ভব এবং বিশেষ করে বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে থাকে।

এক্ষেত্রে যা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার তা হল, সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকা অবস্থায় একটি পশ্চাৎপদ দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ স্বাধীনভাবে সম্ভব হয় না এবং স্বাধীনভাবে সেটা সম্ভব না হওয়ার কারণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার আর ধ্যানধারণার প্রভাব। ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, নিয়মাবলীর পারস্পরিক প্রভাব এমন এক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বিদ্যমান থাকে যখন অনেক বাহ্যিক জৌলুস সত্ত্বেও ধনতন্ত্র আর সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয় হতে থাকে, তারা ধ্বংসের নিকটবর্তী হয়। সামন্তবাদ আর ধনতন্ত্রের ক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়াই মোটামুটিভাবে জারী থাকতে দেখা গেছে এবং সামন্তবাদকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে ধনতন্ত্রের আর তার নিয়মাবলীর পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ও বিকাশ ঘটতে সময় লেগেছে। শুধু তাই নয়। এই পর্যায়ে ক্ষয়িষ্ণুতা ও ধ্বংসন্মোখতা সত্ত্বেও, সাময়িকভাবে হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই সামন্তবাদী ধ্যানধারণা আর শক্তি ধনতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয় অর্জন করেছে। ব্রিটেন আর ফ্রান্সে এই ধরনের টানা পোড়েনের ব্যাপার এ দুই দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের এবং উপরিকাঠামো গঠনের ইতিহাসে অনেক দেখা গেছে। এসব ঘটনা উল্লেখযোগ্য এজন্য যে, এ দুই দেশেই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উদ্ভব আর বিকাশ ধনতন্ত্রের ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে ঘটেছে।

লেনিন এবং বিশেষ করে স্ট্যালিনের আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নে তাই অনেক কিছুই করার প্রয়োজন অনিবার্য হয়েছিল যেসব কাজ নিরুপদ্রব সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ক্ষেত্রে করার প্রয়োজন একেবারেই হয় না। উদাহরণস্বরূপ, স্ট্যালিনের আমলে যৌথ খামার প্রথা প্রচলনের উল্লেখ করা যেতে পারে। বিপ্লব–পূর্ব পর্যায়ে রাশিয়ায় ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে কৃষি–উৎপাদন–ক্ষেত্রে যদি সামাজিকীকরণ সম্পন্ন হয়ে থাকত, তাহলে স্ট্যালিনকে তৎকালীন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে যৌথ খামার প্রথা চালু করতে গিয়ে যেভাবে কিছুটা বল প্রয়োগের আশ্রয় নিতে হয়েছিল, বিশেষত কুলাকদের ক্ষেত্রে সেটার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বাস্তবত তখন তার প্রয়োজন হয়েছিল এবং সেভাবে যদি পরিস্থিতির মোকাবেলা করা না হত তাহলে কৃষি, শিল্প, বন্টনব্যবস্থা ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী বাস্তবায়িত করা যেত না এবং খুব দ্রুতগতিতে প্রতিবিপ্লব সেখানে বিপ্লবকে পরাভূত করত। এক্ষেত্রে যারা স্ট্যালিনের সমালোচনা করে থাকে, যারা তাকে, তার নেতৃত্বাধীন পার্টিকে বলপ্রয়োগ, নির্মমতা ইত্যাদির অভিযোগে অভিযুক্ত করে থাকে, তারা হয় তৎকালীন পরিস্থিতির

সব দিক বিবেচনা করে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ–কাজের ক্ষেত্রে করণীয় কি হতে পারে তা নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়, অথবা ট্রটস্কিপন্থী এবং বিভিন্ন ধরনের বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টদের পরিচিত স্ট্যালিন ও সমাজতন্ত্র–বিরোধী বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে সে কাজ করে।

সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা আক্রান্ত ও ঘেরাও হয়ে থাকা, তাদের এজেন্ট এবং স্থানীয় সামন্ত–ধনতান্ত্রিক স্বার্থসমূহের অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার মোকাবেলা করে চলা এবং প্রয়োজনীয় কোনো ধরনের পণ্যসামগ্রীর আমদানী অসম্ভব থাকায় সব কিছু অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদন করা এবং যৌথভাবে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সুষমভাবে বন্টন করার দায়িত্ব তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে যাঁদের উপর ছিল তাঁরা এমন এক গুরুদায়িত্ব বহন করতেন যে সে দায়িত্বের প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি বুর্জোয়া চিন্তায় অভ্যস্ত ব্যক্তি অথবা বৈঠকখানার কেদারায় উপবিষ্ট বিপ্লবী অথবা ট্রটস্কি ও ট্রটস্কিপন্থীদের মতো অন্ধ স্ট্যালিন–বিরোধীদের কাজকর্ম ও রচনার মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয় এবং সেটা পাওয়াও যায় না। তৎকালীন পরিস্থিতিতে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি, সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং স্ট্যালিনকে যেসব কাজ করতে হয়েছিল, ক্ষেত্র বিশেষে কিছু ত্রুটি–বিচ্যুতি থাকলেও (যা দুই কারণে ছিল স্বাভাবিক। প্রথমত, ত্রুটি–বিচ্যুতি ঘটা সব সময়েই সম্ভব; দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা সেই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে কারো ছিল না) একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, লেনিন এবং বিশেষত স্ট্যালিনের আমলে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ–কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে সোভিয়েত পার্টি আর রাষ্ট্রকে যে সব পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল সেগুলি অনিবার্য ছিল, সেগুলি নেয়া ব্যতীত অন্য কিছু করা তৎকালীন পরিস্থিতিতে সম্ভব ছিলনা।

শুধু তাই নয়। এখানে আর একটি কথা খুব স্পষ্টভাবেই বলা দরকার "স্ট্যালিনবাদ" এর কথা উঠলে স্ট্যালিন নিজে সব সময়েই তার নিজের অবস্থানকে এইভাবে আখ্যায়িত করার বিরুদ্ধে আপত্তি করতেন এবং বলতেন, 'স্ট্যালিনবাদ' বলে পৃথক আর স্বতন্ত্র কিছু নেই, তিনি নিজে লেনিনের একজন শিষ্য মাত্র এবং তিনি যা কিছু করেছেন সেটা তিনি করেছেন লেনিনের শিষ্য হিসেবেই। একথা সঠিক। কারণ, বস্তুতপক্ষে পরিস্থিতির নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে স্ট্যালিনকে যেসব কর্তব্য নির্ধারণ করতে হয়েছিল, যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে হয়েছিল, সেগুলি সবই ছিল লেনিনবাদের অনুবর্তী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ট্রটস্কি এবং ট্রটস্কিবাদীরা, আর সেই সাথে বিভিন্ন বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী মহল স্তালিনের দ্বারা অনুসৃত নীতি আর কর্মসূচীসমূহকে লেনিনের চিন্তাধারা থেকে পৃথক করে দেখাবার চেষ্টায়, তাকে লেনিনবাদের বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত ও আখ্যায়িত করে এসেছে এবং এখনো পর্যন্ত সেটাই করে চলেছে। সেই হিসেবে আজকের দিনে "স্ট্যালিনবাদ" সম্পর্কে

সুনির্দিষ্টভাবে কিছু না বললে বিপ্লবোত্তর পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে যেসব সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী নির্ধারিত, অনুসৃত ও বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যবাদের ও সাম্রাজ্যবাদের সহায়তাপ্রাপ্ত রুশ প্রতিবিপ্লবীদের অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার মোকাবেলা করতে গিয়ে যেসব নীতি, সংস্থা–সংগঠন ইত্যাদি অপরিহার্যভাবে গ্রহণ ও গঠন করতে হয়েছিল এবং তার পরিণতিতে কিভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বুর্জোয়া প্রভাব বিস্তার লাভের বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা তৎকালীন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বোঝা যাবে না।

স্ট্যালিনবাদ হল এমন এক ঐতিহাসিক সময়ের মার্কসবাদ আর সমাজতন্ত্র, যে পর্যায়ে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে বিপ্লবের পরিবর্তে পশ্চাৎপদ দেশসমূহের শ্রমিক–কৃষকের যৌথ বিপ্লবের মাধ্যমে সামন্ত বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা থেকে উৎখাত হয়, যে পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ আর তাদের সাহায্যপ্রাপ্ত এজেন্টদের বহিরাক্রমণ ও অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার মোকাবেলা করে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ–কাজ সম্পন্ন করে যেতে হয়। স্ট্যালিন লেনিনবাদকে সাম্রাজ্যবাদের যুগের মার্কসবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। সেটা সঠিক ছিল। এবং সেই আখ্যা অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করতে গেলে এবং সেই পরিস্থিতিতে লেনিন আর স্ট্যালিনের অনুসৃত নীতির পর্যালোচনা আর মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে, উপরে "স্ট্যালিনবাদের"র সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে যা বলা হয়েছে, সেটা লেনিনবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এজন্য প্রকৃত অর্থেই লেনিনবাদ ও স্ট্যালিনবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। স্তালিনবাদ হল সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিন পরবর্তী যুগে লেনিনীয় নীতিরই অনুশীলন আর পরিবর্ধন মাত্র।

বিপ্লবের অল্পকাল পরই ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে লেনিনের মৃত্যু ঘটার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ–কাজের মূল দায়িত্ব স্ট্যালিনের উপরই বর্তায় এবং স্ট্যালিন সেই দায়িত্ব অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেন। একটি পশ্চাৎপদ দেশ থেকে সমগ্র রাশিয়া তাঁর নেতৃত্বে পরিণত হয় একটি শক্তিশালী শিল্পোন্নত দেশে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক ও স্বার্থ উচ্ছেদ করে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক, সকলের জন্য হয় কর্মসংস্থান, বন্টন ব্যবস্থা সুষম করে সেখানে জনগণের জন্য হয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত। বিশ্বের দেশে–দেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে বৈপ্লবিক প্রেরণা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী হতে থাকে। এরপর এক ভয়ানক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদের মোকাবেলা করে, তাকে পরাজিত করে যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে অপরাপর ইউরোপীয় দেশের মতো মার্কিনের থেকে প্রাপ্ত সাহায্য ছাড়াই নিজেদের সম্পদের উপর নির্ভরশীল থেকে পুনর্গঠন–কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে ১৯৫৩

সালের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত করে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন পার্টি ও রাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের তুলনায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণসিদ্ধ করে। এইসব "অপরাধমূলক" কাজের জন্যই সমগ্র বুর্জোয়া মহলে স্ট্যালিনের ক্ষমা নেই। তারা ক্ষেত্রবিশেষে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, এমনকি পরবর্তী কালে মাও সম্পর্কে দু-চারটি প্রশংসাসূচক কথা বললেও (যদিও এখন তারা লেনিন আর মাও-এর বিরুদ্ধে নোতুন উদ্যমে তাদের সমালোচনা আবার শুরু করেছে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, এমনকি খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নেও লেনিনের মূর্তি পর্যন্ত অপসারণ করছে, ভেঙে ফেলছে) স্ট্যালিন সম্পর্কে তাদের কণামাত্র ইতিবাচক মূল্যায়ন নেই।

একটি পশ্চাৎপদ দেশে বিপ্লব হলে এবং সেখানে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কাজের সাথে সমান্তরালভাবে কিছু বুর্জোয়া উপাদানের উপস্থিতিও অনিবার্যভাবে থাকলে, দুইয়ের টানাপোড়েনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সংশোধনবাদ যে মাথা চাড়া দিতে পারে একথা লেনিন, স্ট্যালিন, মাও- সকলেই বলে এসেছেন। লেনিন এ বিষয়ে তাত্ত্বিকভাবে যথেষ্ট আলোচনা বিপ্লবোত্তর পর্যায়ে তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে করে গেছেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সম্পর্কেও ঠিক এ কারণেই সতর্ক করে গেছেন। কাজেই সোভিয়েত ইউনিয়নে, পূর্ব ইউরোপের এককালীন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আর চীনে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে সেটা মার্কসবাদীদের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কোনো ব্যাপার নয়। উপরন্তু এইসব পরিবর্তন এবং ইতিহাসের এই পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক দেশের ধনতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের ব্যাখ্যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদই এতদিন বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রদান করে এসেছে এবং এখনো সেইভাবেই সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পরিবর্তনকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কারণ, এই ব্যাখ্যা সঠিকভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্মতভাবে উপস্থিত করতে না পারলে সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব-ইউরোপ, চীন ইত্যাদি দেশে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে আর ঘটে চলেছে, তাকে সমাজতন্ত্রের পতন ও ধ্বংস হিসেবে সাম্রাজ্যবাদীরা যেভাবে প্রচার করছে সেই প্রচারই জনগণের মধ্যে প্রাধান্যে থাকবে এবং তার ফলে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

একটি অথবা একাধিক সমাজতান্ত্রিক দেশ যত দিন শক্তিশালী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকে, ততদিন সে দেশগুলির অভ্যন্তরে ধনতান্ত্রিক শক্তিসমূহ যে সক্রিয় থাকে, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রেণীবিভক্ত সমাজে একটি শ্রেণী যতই শোষিত নির্যাতিত হোক, তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যথেষ্ট ভোগ বিলাস এবং উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে জীবনযাপন করে। তাদের এই জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রচার সমাজতান্ত্রিক দেশের অভ্যন্তরে ধনতান্ত্রিক-প্রবণতাসম্পন্ন লোকদের উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। সচেতন ও

সক্রিয়ভাবে এই প্রভাবের মোকাবেলা করা না হলে তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর শেষ পর্যন্ত প্রাধান্যে আসে। কাজেই যতদিন না সাম্রাজ্যবাদ এবং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পতন হচ্ছে অথবা বিশ্বব্যাপী তারা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ছে, ততদিন কোনো দেশেই সমাজতান্ত্রিক নিয়মাবলীর সুষ্ঠু ও মসৃণ বিকাশ সম্ভব নয়।

১৯৮৯ সালের ঘটনাবলী লক্ষ্য করে অনেকের মনে হতে পারে যে, সারা বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এবং শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের বিজয় অর্জনের কোনো সম্ভাবনা আর নেই। কিন্তু সমাজবিকাশের ধারা,তার নিয়মাবলীর দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে এর থেকে ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হতে পারে না। ১৯৮৯ সালে ইউরোপে যা ঘটেছে তার ফলে সারা বিশ্বে শ্রেণীসংগ্রাম কি থেমে গেছে? ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সামাজিক–উৎপাদনের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বিরাজমান সে দ্বন্দ্বের কোনো সমাধানের ইঙ্গিত কি ১৯৮৯ সালের ঘটনাবলীর মধ্যে আছে? সমাজতন্ত্র বাতিল করে দিলে তার পরিবর্তে অন্য কোনো বিশ্ব ব্যবস্থার বাস্তব আবির্ভাব এমনকি তাত্ত্বিক সূত্রায়ণ কি হয়েছে? না, এসব কিছুই হয় নি এবং হওয়াও সম্ভব নয়। কারণ, ১৯৮৯ সালের ঘটনাবলী সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রই হচ্ছে ধনতন্ত্রের পরবর্তী ঐতিহাসিক বিশ্ব–ব্যবস্থা। একমাত্র এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত মৌলিক দ্বন্দ্ব এবং তার থেকে সৃষ্ট হাজারো দ্বন্দ্বের মীমাংসা আর সমাধান সম্ভব। মার্কসবাদ–লেনিনবাদ সমাজ বিকাশের এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার, সমাজবিকাশের এই নিয়মাবলীরই সূত্রায়ণ।

সারা বিশ্বের অনুন্নত পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদ আর তার অনুগত শোষক–শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে। আমাদের দেশও সেদিক থেকে কোনো ব্যতিক্রম নয়। এই সংগ্রাম চলতে বাধ্য, কারণ আমরা সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক শোষণে জর্জরিত, তার নির্মম শাসন আমাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ শোষণ এবং শাসন অবসানের জন্য যে সংগ্রাম করতে হয় তা ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে, এই সংগ্রামের অবসানে যে সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয় তা হল সমাজতন্ত্র। কাজেই, পূর্ব–ইউরোপে, সোভিয়েত ইউনিয়নে বা চীনে যা ঘটেছে তার থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আমাদের থাকলেও তার থেকে একথা মনে করার কোনো কারণ আমাদের নেই যে, সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যতের কথা বলা এক অর্থহীন বাগাড়ম্বর। মোটেই তা নয়। উপরন্তু, আমাদের কাছে সমাজতন্ত্র একটি অতি আবশ্যিক ব্যবস্থা যা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যাওয়াই বর্তমান পর্যায়ে আমাদের সব থেকে জরুরী বর্তব্য।

কিন্তু শুধু বিশ্বের পশ্চাৎপদ দেশগুলিতেই নয়, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও ১৯৮৯ সালের ঘটনাবলীর পরও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম চলছে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে

জোরদার হচ্ছে। পূর্ব-ইউরোপের যে দেশগুলিতে ধনতান্ত্রিক "স্বর্গের" চিত্র "নতুন বিপ্লব" সৃষ্টি করেছে সেগুলিতেও এখন ব্যাপক আকারে শ্রমিক ধর্মঘট চলছে এবং সেইসব ধর্মঘট নব্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে আঘাত করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আগ্রাসন বিভিন্ন দেশে বৃদ্ধি করলেও তার মধ্যে তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির কোনো পরিচয় নেই। উপরন্তু তাদের অন্তর্নিহিত সংকটই তাদেরকে নোতুনভাবে আগ্রাসনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একারণে তাদের এই আগ্রাসন বেশিদিন অব্যাহত রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসংকটের কারণে ও সমাজ বিকাশের নিয়ম অনুযায়ী সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্র পিছু হটতে বাধ্য। সেই পরিস্থিতিতে বিশ্বের দেশে-দেশে নোতুনভাবে বিপ্লবের জোয়ার দেখা দেবে, যেভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ঔপনিবেশিকতার কবল থেকে মুক্তি লাভ করে একের পর এক দেশ তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছিল।

সারা বিশ্বে এই পরিবর্তনের ধারা প্রবর্তিত হলে সমাজতন্ত্র তার প্রাথমিক পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল সে পরিস্থিতির অবসান ঘটবে। তখন এক একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে খুব স্বাভাবিক, সুষ্ঠু এবং অপেক্ষাকৃত মসৃণভাবে সমাজতান্ত্রিক নিয়মাবলীর আবির্ভাব আর প্রতিষ্ঠা, অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক, প্রশাসন, দেশ রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্ভব হবে। এই পরিবর্তনের ফলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অতীতের থেকে হাজারো গুণে নিরাপদ ও হুমকিবিহীন হবে। কারণ তখন সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা সমাজতন্ত্রের ঘেরাও হওয়ার পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দ্বারা সাম্রাজ্যবাদই ঘেরাও হবে এবং ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে।

কাজেই ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর পূর্ব ইউরোপের ঘটনাবলীর পরে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সব প্রশ্নের আর সন্দেহের উদ্ভব হয়েছে তার জবাবে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নেই একথা ঠিক নয়, কারণ সমাজতন্ত্রই হল মানব সমাজের ভবিষ্যৎ।

৩.৯.১৯৯০

'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম'

যতীন সরকার

অনতিক্রান্ত যৌবনে রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষণিকা' কাব্যে লিখেছিলেন,–'মনেরে আজ কহ যে–ভালোমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে'। কবি কথাগুলো বলেছিলেন খুবই হাল্‌কা চালে, পুরো 'ক্ষণিকা' কাব্যটিই একান্ত হাল্‌কা চালে লেখা। এমন হাল্‌কা চালে অনেক অনেক গভীর কথা অন্য কোন কবি কখনো বলেছেন কিনা, আমি জানি না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কখনো বলেননি, 'ক্ষণিকা'র দোসর হওয়ার মতো আর কোনো কাব্যই তিনি লিখেননি।

তবে, সত্য সম্পর্কে 'ক্ষণিকা'য় তিনি যা একান্ত সহজে বিবৃত করে ফেলেছেন তা মোটেই তাঁর উপলব্ধির ক্ষণিক উদ্ভাসন নয়। সারা জীবন ধরে এই বোধটি তিনি অপরিবর্তিত রূপেই লালন করেছেন, জীবনের বিভিন্ন পর্বে তাঁর প্রকাশ রীতির পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র, প্রকাশের বৈচিত্র্যের মধ্যে এক সত্যই নানা মাত্রার বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছে শুধু। সত্যকে সহজে গ্রহণ করার সার্বক্ষণিক আকুতি ছিল বলেই অসত্যের ভয়ে তিনি জবুথবু হয়ে থাকতেন না, ভুলকে এড়িয়ে চলার নাম করে বদ্ধঘরে নিরাপত্তার সন্ধান করতেন না, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে যোগাসনে বসতে কখনো রাজি হতেন না। একই দ্বার পথে যে সত্য–অসত্য ও ভুল–শুদ্ধের আগমন–নির্গমন ঘটে, একথা তিনি জানতেন। তাই, 'ক্ষণিকা'য় যে–কবি ভালোমন্দ নির্বিশেষে সত্যকে গ্রহণ করেছিলেন অতি সহজে, সেই কবিই 'ক্ষণিকা'য় একান্ত সঙ্গত প্রশ্ন রেখেছিলেন,–

দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।

সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?

সত্যকে ঢুকতে দেয়ার জন্য দরজা সব সময়ই খোলা রাখতে হবে, সেই খোলা দরজা দিয়ে অনেক ভুল ও অসত্যও ঢুকে পড়বে নিশ্চয়। তবুও, অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় রাখা প্রয়োজন ঃ ভুল ও অসত্যের চেয়ে শুদ্ধ ও সত্যের শক্তি সব সময়ই বেশি, শুদ্ধ ও সত্যের কাছে ভুল ও অসত্য পরাজিত হবেই। তাই, খোলা দরজা দিয়ে ভুল ও অসত্য ঢুকে পড়বে বলে সত্য সন্ধানীরা কখনো বিচলিত হতে পারে না। তা ছাড়া ভুল–শুদ্ধ ও

সত্য-অসত্য উভয়েরই জন্ম হয় কর্মের প্রয়োগশালায়; এবং সেই কর্মশালাতেই ঝাড়াই বাছাই হয়ে শুদ্ধ ও সত্য টিকে থাকে, ভুল ও অশুদ্ধ বিদায় নেয়। যারা কাজ করে না তারা ভুলও করে না, শুদ্ধও করে না; তারা সত্যকেও পায় না, অসত্যকেও না। ভুল-পরিহারকারী অকর্মা ও প্রচুর ভুল সৃষ্টিকারী কর্মীদলের কথা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যথাক্রমে টিকি ও হাত পায়ের রূপকে চমৎকারভাবে উঠে আসে-

টিকি মুণ্ডে চড়ি উঠি কহে ডগা নাড়ি,
হাত-পা প্রত্যেক কাজে ভুল করে ভারি।
হাত-পা কহিল হাসি, হে অভ্রান্ত চুল,
কাজ করি আমরা যে, তাই করি ভুল।

কাজ করলেই ভুল হয়, আর ভুলের পঙ্কেই ফোটে সত্যের পদ্ম, একথা যে কবি জানতেন সে কবিই সত্যের জন্য ভালোমন্দকে তুল্য জ্ঞান করতে পারতেন। কারণ সত্য যদি আপাত 'মন্দ'কে তুলে আনে কখনো, তবে বুঝতে হবে যে এর পেছনে পেছনেই 'ভালো' উঠে আসবে। সত্যকে 'সত্য' রূপেই চিনে নিতে হবে, 'ভালো' বা 'মন্দ' রূপে নয়। মাছ মারার জাল যদি নদী থেকে একটুও কাদা না-উঠিয়ে কেবল মাটিই উঠিয়ে আনতে চায়, তবে সে ব্যর্থ হবেই-

জাল কহে, পঙ্ক আমি উঠাব না আর।
জেলে কহে, মাছ তবে পাওয়া হবে ভার।

সত্যকে পেতে হলে প্রতিনিয়ত অনেক অসত্যের কাদা ঘাটতে হবে, সারা জীবনের ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। সত্য মোটেই সহজ বা সহজলভ্য নয়, এ কথা তিনি জানতেন। তাই, 'সত্যেরে লও সহজে' বলে নিজের মনকে আহবান জানিয়েও ভেতরে ভেতরে সব সময়ই সত্যের কাঠিন্যকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। সেই প্রস্তুতির দরুনই মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগেও তিনি 'রূপ-নারানের কূলে' জেগে উঠে 'এ-জগৎ স্বপ্ন নয়' বলে নিঃসংশয় উপলব্ধিতে সঞ্জীবিত হয়েছিলেন, 'রক্তের অক্ষরে' 'আপনার রূপ' দেখে 'আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায়' আত্মপরিচয় লাভ করে দ্ব্যর্থহীন উচ্চারণে বলে উঠেছিলেন,- 'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।'

কঠিন সত্যকে ভালোবাসার সাধনাই রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের সাধনা।

দুই. আবাল্য উপনিষদের দর্পণে রবীন্দ্রনাথ সত্যের কঠিন রূপ দেখেছিলেন। সত্যসাধনার পথও উপনিষদের মধ্যেই খুঁজেছিলেন। কিন্তু, জীবনের প্রান্ত সীমায় গিয়ে তিনি কবুল করলেন যে, উপনিষদের বাণীর অন্তর্নিহিত সত্যকে তিনি চেষ্টা করেও বাস্তবে রূপ দিতে পারেন নি, তাঁর পূর্বপুরুষেরা পারেন নি। সারা পৃথিবী ঘুরে

দেখেছেন; কোথাও কেউ পারেন নি। তবে ১৯৩০ সালে এমন একটি দেশে যাওয়ার তাঁর সৌভাগ্য হলো, যেখানে গিয়ে উপনিষদের বাণীর বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। দেখলেন যে, এদেশটি 'অন্য কোন দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমানভাবে জাগিয়ে তুলছে।' দেশটির নাম রাশিয়া। এদেশে 'না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকতো' বলে তিনি সারা মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করলেন। রাশিয়া যে-মানবতার তীর্থভূমিতে পরিণত হলো তার কারণ, রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায়, ওদেশের মানুষেরা উপনিষদের 'মা গৃধ' বা 'লোভ করে না' অনুজ্ঞাটি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করতে পেরেছে, মানুষের পাঁজর থেকে 'লোভ' নামক রিপুটিকে কেটে বার করে দিয়েছে। উপনিষদের ভাবাশ্রিত বাণীর বস্তুতান্ত্রিক তাৎপর্য ও বাস্তব রূপায়ণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতেই স্পষ্ট হতে দেখে তিনি তাঁর আজীবনের অভ্যস্ত চিন্তাচেতনাকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করে নেয়ার তাগিদ অনুভব করলেন। 'রাশিয়ার চিঠি'র মতো বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধগ্রন্থ লিখেই তৃপ্ত হলেন না, সৃষ্টিশীল সাহিত্যের নব-অনুভূত সমাজ সত্যের প্রকাশ ঘটালেন 'রথের রশি' নামক নাটকে। অবশ্যি স্বচক্ষে রাশিয়া দেখার অনেক আগেই তিনি 'রথ যাত্রা' নামে একটি নাটিকা লিখেছিলেন, রাশিয়া দেখার পর সেই 'রথ যাত্রা'ই পরিণত রূপ পেলো 'রথের রশি'তে। এ নাটকে তিনি সমাজ তথা সভ্যতা রূপ রথের অগ্রগমনের রীতি নিয়মের উদ্‌ঘাটন করেছেন। 'রথের রশি'র বিষয়বস্তুটা এ-রকম ঃ

অনেকদিন-ধরে-চলে-আসা রথ হঠাৎ করে অচল হয়ে গেলো। প্রথম যুগে পুরোহিত শক্তির হাতে রথ চলেছিল, এর পর পুরোহিতের হাত থেকে রথ চালাবার দায়িত্ব নেয় ক্ষত্রিয়রা, তারপর বৈশ্য বা বণিকরা। কিন্তু এখন পুরোহিত বা রাজা বা ধনপতি কারো হাতের টানেই এ রথ চলছে না, পুরোহিতের শাস্ত্র কিংবা ক্ষত্রিয়ের শাস্ত্র কিংবা ধনপতির ধন সবই আজ সমাজরথ চালাতে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়ে গেছে। এমন সময় প্রবল জলস্রোতের মতো বেগে ধেয়ে এলো সেই শূদ্রের দল, যারা এতোকাল ছিল অচ্ছ্যুৎ, ছিল 'সবার পিছে সবার নীচে'। আজ সেই সর্বহারাই এতোদিনকার কায়েমী স্বার্থভোগী পুরোহিত, রাজা ও বণিকের বাধা ঠেলে সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে রথের রশিতে এসে লাগালো হাত। আর এই শূদ্রের- অর্থাৎ রাজনৈতিক পরিভাষায় প্রলেতারিয়েতের-টানে সমাজরথের চাকা সচল হলো, চললো ঘর্ঘর করে। ঘটে গেলো যুগান্তর।

দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আবিষ্কৃত সত্যকে দেখবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মার্কস-এঙ্গেলস পড়বার প্রয়োজন পড়েনি; শিল্পীর তৃতীয় নয়ন দিয়েই সে সত্য অবলোকন করতে পেরেছিলেন, 'রথের রশি'তে ঘটেছিল সে-সত্যেরই শিল্পসম্মত প্রকাশ। বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতে গিয়ে সে-সত্যের বাস্তব রূপায়ণকে চর্মচক্ষে দেখেও এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শ্রেণীসংগ্রামকে সমাজ-ইতিহাসের অন্যতম প্রধান

চালিকাশক্তি বলে মানতেন না,–এমন কথা যাঁরা বলেন, 'রথের রশি' তাদের ঘনিষ্ঠ মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করা উচিত। এবং তারই সঙ্গে মিলিয়ে 'রাশিয়ার চিঠি'রও পুনঃপাঠ প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্য কখনো একমাত্রিক বা নির্দ্বন্দ্ব ছিল না। সত্যের বহুমাত্রিকতা ও দ্বান্দ্বিকতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল বলেই 'রাশিয়ার চিঠি' বিপ্লবোত্তর রুশ দেশ সম্পর্কে কতকগুলো নির্জলা প্রশংসাবাক্যের সমাহার হয়ে থাকেনি কেবল। রাশিয়ার লাগামছাড়া প্রশংসা বা নিন্দা কোনটাই তিনি করেননি, রাশিয়া বা তার শত্রুপক্ষ কারুরই 'প্রিয়' হওয়া তাঁর লক্ষ্য ছিল না, একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল 'সত্য' হওয়া। পরিষ্কার ভাষায় তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, – "আমাদের পৃথিবীর মেয়াদ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে; অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।" সে-কারণেই 'রাশিয়ার চিঠি'র একেবারে প্রথম অধ্যায়ে নতুন রাশিয়ার সকল ইতিবাচকতার বর্ণনা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যদ্রষ্টা ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষির দৃঢ়তা নিয়ে বলে উঠেছেন,–"এর মধ্যে গলদ কিছুই নেই তা বলি নে; গুরুতর গলদ আছে। সেজন্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে-গলদ হচ্ছে, শিক্ষা-বিধি নিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে- কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেকে না- সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তাহলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।"

চিন্তায় ও দৃষ্টিতে দান্দ্বিক পদ্ধতির প্রতি আনুগত্যের দরুনই কঠিন সত্যের দ্বান্দ্বিক রূপ সর্বদা তিনি অবলোকন করতে পেরেছেন। তাই, নতুন রাশিয়াকে মানবতার তীর্থভূমি বলে মেনে নিয়েও এর গলদগুলোর প্রতি যেমন তিনি মুদিতদৃষ্টি হয়ে থাকেন নি তেমনি এগুলোর উদ্ভবের কার্যকরণ সম্পর্কটিকেও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে ভোলেন নি; এবং তা দেখাতে গিয়েও সহৃদয়তা ও সহমর্মিতা পরিত্যাগ করেন নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ঃ যে-কোন প্রকার বল প্রয়োগের প্রতি তাঁর অনুমোদন না থাকলেও, নতুন রাশিয়ার স্থপতিবৃন্দ যে একান্ত বাধ্য হয়েই কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিয়েছেন, সে-বিষয়ের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন,– "রাশিয়ার অবস্থা যুদ্ধকালের অবস্থা। অন্তরে বাহিরে শত্রু। ওখানকার সমস্ত পরীক্ষাকে পন্ড করে দেবার জন্য চারিদিকে নানা ছলবলের কাণ্ড চলছে। তাই ওদের নির্মাণ কাজের ভিতটা যত শীঘ্র পাকা করা চাই, এ জন্যে বল প্রয়োগ করতে ওদের কোনো দ্বিধা নেই।"

বল প্রয়োগের মতো 'ডিকটেটরশীপ' বা একনায়কত্বের দ্বান্দ্বিক রূপ সদর্থকতা ও নঞর্থকথার সম্মিলিত রূপটিকে দেখেছেন বলেই তিনি লিখতে পেরেছেন,–

ডিকটেটরশীপ একটা মস্ত আপদ, সে-কথা আমি মানি এবং সেই আপদের বহু অত্যাচার রাশিয়ায় আজ ঘটছে সে-কথাও আমি বিশ্বাস করি। এর নঞর্থক দিকটা জবরদস্তির-- সেটা পাপ। কিন্তু সদর্থক দিকটা দেখেছি, সেটা হল, শিক্ষা, জরবদস্তির একেবারে উলটো।"

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রতি রাশিয়ার বলশেভিকরা নির্মম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে বলে উথাপিত অভিযোগও রবীন্দ্রনাথ সত্য বলে মানেন। কিন্তু এ–উপেক্ষারও যে উদ্ভব ঘটেছে সমষ্টির প্রতি ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সীমাহীন উপেক্ষার প্রতিক্রিয়ায়, ধনসঞ্চয়ের জন্য অমানবিক প্রতিযোগিতার বিপরীতে মানবিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং সে–লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পরই যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রতি এই অন্তর্বর্তীকালীন উপেক্ষার অবসান ঘটবে, রবীন্দ্রনাথের দ্বান্দ্বিক সত্য দৃষ্টিতে তা–ও ধরা পড়েছে। 'রাশিয়ার চিঠি'র 'উপসংহার' নামক দীর্ঘ অধ্যায়টিতে ধনতন্ত্রের মানবতা–বিরোধী আচরণের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের পরই বলশেভিক রাশিয়া সম্পর্কে তার মন্তব্য ঃ

"বর্তমান সভ্যতার এই অমানবিক অবস্থায় বলশেভিক নীতির অভ্যুদয়; বায়ুমণ্ডলের এক অংশের তনুত্ব ঘটলে ঝড় যেমন বিদ্যুদ্দন্ত পেষণ করে মারমূর্তি ধরে ছুটে আসে এ–ও সেই রকম কাণ্ড। মানবসমাজে সামঞ্জস্য ভেঙে গেছে বলেই এই একটা অপ্রাকৃতিক বিপ্লবের প্রাদুর্ভাব। সমষ্টির প্রতি ব্যাষ্টির উপেক্ষা ক্রমশ বেড়ে উঠেছিল বলেই সমষ্টির দোহাই দিয়ে আজ ব্যাষ্টিকে বলি দেবার আত্মঘাতী প্রস্তাব উঠেছে। তীরে অগ্নিগিরি উৎপাত বাঁধিয়ে দিয়েছে বলে সমুদ্রকেই একমাত্র বন্ধু বলে এই ঘোষণা। তীরহীন সমুদ্রের রীতিমত পরিচয় যখন পাওয়া যাবে তখন কূলে উঠবার জন্যে আবার আঁকুবাঁকু করতে হবে। সেই ব্যষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা কখনোই মানুষ চিরদিন সইবে না। সমাজ থেকে লোভের দুর্গগুলোকে জয় করে আয়ত্ত করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে বৈতরণী পার করে দিলে সমাজ রক্ষা করবে কে? অসম্ভব নয় যে, বর্তমান রুগ্ন যুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসা; কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকারের হতে পারে না, বস্তুত ডাক্তারের শাসন যেদিন ঘুচবে সেই দিনই রোগীর শুভদিন।"

দ্বিতীয় অংশ

তা হলে কথাটা কী দাঁড়ালো? অসামঞ্জস্যকে দূর করার জন্যই ঘটে বিপ্লব, আবার সেই বিপ্লব থেকেও উদ্ভব ঘটে কিছু নতুন অসামঞ্জস্যের। তখন আবার সেই অসামঞ্জস্য ঘুচানোর জন্য চলে অন্যতর প্রক্রিয়া। এই তো সত্যের দ্বান্দ্বিক নিয়ম। এই দ্বান্দ্বিক নিয়মটির মননশীল বিশ্লেষণ যেমন 'রাশিয়ার চিঠি' তেমনি এর শৈল্পিক উদ্ভাসন 'রথের রশি'। রবীন্দ্রনাথ মহৎ শিল্পী বলেই মননশীল প্রবন্ধের চেয়ে কাব্য বা নাটকের মতো শিল্প সৃষ্টির মধ্য দিয়েই সত্যকে অনেক বেশী গভীরভাবে প্রকাশ করতে পারেন। তাই 'রাশিয়ার চিঠি'র চেয়ে 'রথের রশি'তে তিনি অধিকতর স্বচ্ছন্দ।

'রথের রশি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলো 'কবি'। এবং নাটকটি পড়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে এই 'কবি' আর কেউ নন, তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই। মহাকালের অচল–হয়ে–যাওয়া রথ যেন পুরোহিত, রাজা ও ধনপতিদের বদলে সর্বহারা শূদ্রদের হাতে চলতে শুরু করলো, তখন অনেকের কাছেই এটি 'উল্টো

পাল্‌টা ব্যাপার' বলে মনে হলো। তারা কবির কাছে এর রহস্য সন্ধানের জন্য এলে কবি বললেন যে ঃ পুরোহিত, রাজা ও ধনপতিরা এতোকাল রথের উঁচু চূড়াটার দিকেই দৃষ্টি রেখেছে, রথের দড়িটির দিকে তাকিয়ে দেখেনি। অর্থাৎ 'মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন তাকে ওরা মানেনি।' এই না-মানার ফলেই ঘটলো শূদ্রবিপ্লব। অগণিত সাধারণ মানুষ এতোকাল দূরাবস্থার একেবারে সর্বনিম্ন প্রান্তে অবস্থান করছিল, আর অন্যদিকে মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবান মানুষ অবস্থান নিয়েছিল অনেক বেশী উঁচুতে। এমন অসামঞ্জস্য টিকে থাকতে পারে না। তাই-

"একদিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি,
ঠাকুর নীচে দাঁড়ালেন ছোটোটার দিকে,
সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়োটাকে দিলেন কাত করে।
সমান করে নিলেন তাঁর আসনটা।"

কবি শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হলেন না। ভবিষ্যতে এই শূদ্ররাই যে একদিন ক্ষমতার দম্ভে পূর্বতন শাসকদের মতোই আচরণ করতে শুরু করবে, সেই তিক্ত সত্যটাকেও তিনি আগাম স্মরণ করিয়ে দিলেন। সেদিন যে আবার একটি মহা পরিবর্তনের মহা প্লাবন ঘটবে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী করে তিনি বললেন-

"তারপরে কোন্-এক যুগে কোন্ দিন
আসবে উল্টোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নীচুতে হবে বোঝাপড়া।"

সত্তর বছর পরে কবির সেই ভবিষ্যদ্বাণীই কি নির্মমভাবে সত্য হয়ে ওঠেনি? উল্‌টো রথের পালাতেই রাশিয়াসহ সমগ্র সমাজতন্ত্রী দুনিয়ার গণবিচ্ছিন্ন শাসকরা কি ক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়েন নি? ও-সব দেশের নতুন যুগের উঁচুতে নীচুতেই কি বোঝাপড়া হচ্ছে না?

'রথের রশি'র কবি কিন্তু শূদ্রবিপ্লবের একেবারে গোড়াতেই এ-বিষয়টি সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পূর্ব যুগের শাসকশ্রেণী রথের দড়িটার প্রতি নজর না দিয়ে- অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধনের গুরুত্বকে স্বীকার না করে- যে গুরুতর অপরাধ করেছিল, সেই অপরাধের যেন পুনরাবৃত্তি না হয় কবি তা-ই চেয়েছিলেন। তাই, তাঁর উপদেশ ছিল ঃ

"এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন-
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধূলোয় ফেলো না;
রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে।

আজকের মতো বলো সবাই মিলে–
যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে;
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক
একবার মাথা তুলে।"

কবির উপদেশ শূদ্রবিপ্লবোত্তর শাসকদের কর্ণগোচর হয়নি। তাই যা ঘটা একান্ত অমোঘ ছিল, তা–ই ঘটেছে। দার্শনিক মার্কস একান্ত তরুণ বয়সে যে–বিচ্ছিন্ন বা এ্যালিয়েনেশনকে শ্রেণীসমাজে সর্বব্যাপ্ত দেখেছিলেন, ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র নির্মাণ–প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে সে–বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটেনি বা তা ঘটে যাবে না– রবীন্দ্রনাথের কবিচৈতন্যে সে–সত্যের প্রতিভাস খুবই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। কবি যথার্থই সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। কালগত দূরত্বে অবস্থান করেও ক্রান্তদর্শী কবি অনেক কঠিন সত্যকে দেখতে পেতেন। আর যতো কঠিনই হোক, সত্যকে সহজে গ্রহণ করার জন্য তিনি নিজেও সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন, অন্যকেও প্রস্তুত থাকার জন্য আহবান জানাতেন।

তবে কি মানুষে মানুষে বৈষম্য, অসাম্য ও বিচ্ছিন্নতাটাই একান্ত সত্য? তাই যদি হয় তবে তো সত্য কেবল কঠিন থাকে না, নিতান্তই কুৎসিৎ হয়ে পড়ে। কিন্তু সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথই তো আমাদের জানিয়েছেন, সত্য কুৎসিত নয়; সত্য সুন্দর, সত্য শিব। বৈষম্য, অসাম্য ও বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়েই তো সত্যের সুন্দর ও শিব রূপের প্রকাশ সম্ভব হতে পারে। অনেক বন্ধুর পথ পেরিয়ে 'আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা'য় 'সত্যের দারুণ মূল্য' শোধ করতে হয়। মহাকালের রথচক্র শূদ্রের হাতের স্পর্শেই যে সচল হয়েছে– এ সত্যকে কেউ মিথ্যা করে দিতে পারবে না। এ কালের 'উল্টো রথের পালা'য় সেই সত্যটাই অসত্যের কাদা ঝেড়ে নির্মল নিষ্পাপ হয়ে দাঁড়াবে, কোনো মতেই পুরনো বৈষম্যের দিকে ফিরে যাবে না; 'বাজার অর্থনীতি'র বিপুল ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও মানুষ কিছুতেই নিজেকে বাজারী পণ্যে পরিণত করতে রাজি হবে না; দানবের সাথে সংগ্রাম করে মানুষ মানবিক সাম্যকেই নিশ্চিত করবে। 'সমাজের সকল সদস্যের পূর্ণ কল্যাণ এবং অবাধ ও সর্বতোন্মুখ বিকাশের' নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যেই ছিল মার্কস–এঙ্গেলস–লেনিনের সাম্যবাদের দিকে অভিযাত্রা। সে–অভিযাত্রা অনেক ভুল পথে চলেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু ভুলটাই তো চিরস্থায়ী হয়ে থাকতে পারে না; অনেক দুর্যোগের কবলে পড়ে তাকে দিকভ্রষ্ট হতে হয়েছে অবশ্যই; কিন্তু 'দুর্যোগের মায়ার আড়ালে'ই তো লুকিয়ে থাকে নিত্যকালীন সত্যের জ্যোতি। সেই ভুলের অবসান ও সত্যের পূর্ণ প্রকাশ ঘটবে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রেমের ও সাম্যের বন্ধনের মধ্য দিয়ে, ব্যক্তিতে–ব্যক্তিতে বা গোষ্ঠীতে–

গোষ্ঠীতে বিদ্বেষমূলক প্রতিযোগিতার বদলে সমবায়ী সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। সমবায়-প্রণালীতে বেড়ে ওঠা ভবিষ্যতের মানব-সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জানতেন-

"সমবায়-প্রণালীতে চাতুরি কিংবা বিশেষ একটা সুযোগে পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড়ো হইতে চাইবে না। মিলিয়া বড়ো হইবে। এই প্রণালী যখন পৃথিবীতে ছড়াইয়া যাইবে তখন রোজগারের হাটে আজ মানুষে মানুষে যে একটা ভয়ংকর রেষারেষি আছে তাহা ঘুচিয়া গিয়া সেখানেও মানুষ পরস্পরের আন্তরিক সুহৃদ হইয়া, সহায় হইয়া মিলিতে পারিবে।"

প্রাচ্যের রবীন্দ্রনাথের এই জানার সঙ্গে প্রতীচ্যের মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিনের জানার কোন পার্থক্য নেই। তা তো থাকবেই না। রবীন্দ্রনাথই তো বলেছেন, 'যা সত্য তার কোনো জিয়োগ্রাফি নেই।'।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সমাজতন্ত্র

হায়দার আকবর খান রনো

ইতিহাসের এক সংকট জনক সময়ের মধ্য দিয়ে আজ আমরা অতিক্রম করছি। এই সময়কে আমাদের যুগের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডী হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। দুই বছর আগে পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটে। তখন সে সম্পর্কে আলোচনা করে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের যে কারণগুলো আমরা চিহ্নিত করেছিলাম, মনে হয়, সেগুলো অনেকখানি সঠিক ছিল। সেই সময়ই গর্বাচেভের বিচ্যুতিসমূহ উল্লেখ করা হয়। তখনও আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় লক্ষ্য করছিলাম। কিন্তু সেই বিপর্যয় যে এত দ্রুত, এত ভয়াবহ আকারে আসবে, তা আমরা ধারণা করতে পারিনি। তবে এখনও চীন, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও কিউবা সমাজতন্ত্রের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। সমাজতন্ত্রের এই বিপর্যয়কে বিরাট কালের মাপে আমরা সাময়িক বলেই মনে করি। আমরা এখনও আগের মতোই জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করি যে, ইতিহাসের অনিবার্য রায় হচ্ছে সমাজতন্ত্রের বিজয় ও পুঁজিবাদের পতন।

তবে একথা সত্য যে, আজকের দিনে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম আগের চেয়ে কঠিন হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর বিরাট অংশ জুড়ে সমাজতন্ত্রের পতনের কারণেই শুধু কঠিন হয়নি; কঠিন হয়েছে এই কারণেও যে, আজকের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এমন সব প্রতিবিপ্লবী মার্কসবাদ–বিরোধী তত্ত্ব ছড়ানো হচ্ছে, যার দ্বারা দুনিয়াব্যাপী শ্রমিক শ্রেণীকে আদর্শগতভাবে নিরস্ত্র করার প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। গোটা বিষয়ে তাই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার করা দরকার। বাংলাদেশের বিপ্লবের স্বার্থেই তা প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আজ থেকে দেড়শ বছর আগে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন– যার অন্যতম মূল কথা হলো শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করবে। বুর্জোয়া রাষ্ট্র ভেঙ্গে প্রতিষ্ঠা করবে সর্বহারার একনায়কত্ব। মার্কসের আমলেই মার্কস এঙ্গেলসকে বিভিন্ন ধরনের ডান সুবিধাবাদী ও অতিবাম অবৈজ্ঞানিক ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সংস্কারবাদী প্রুধোবাদ, অবৈজ্ঞানিক অতি বিপ্লবী ব্লাঙ্কিবাদ, নৈরাজ্যবাদী বাকুনিবাদ

ইত্যাদি বিভিন্ন ভুল মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই বৈজ্ঞানিক ও বিপ্লবী মতবাদ মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পরবর্তীতে লেনিনকেও মার্কসবাদী বলে দাবীদার বিভিন্ন সুবিধাবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মার্কসবাদের বিপ্লবী সত্তাকে রক্ষা করতে হয়েছে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে লেনিন কেবলমাত্র মার্কসবাদের বিপ্লবী সত্তাকেই রক্ষা করেছেন তাই নয়, লেনিনের নেতৃত্বেই ইতিহাসে প্রথম সংঘটিত হলো শ্রমিক শ্রেণীর সফল বিপ্লব, গঠিত হলো প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র–প্রলেতারীয় একনায়কত্ব। ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সূচিত হলো নতুন যুগের–সমাজতন্ত্রের বিজয়ের যুগ। লেনিন কেবলমাত্র সফল বিপ্লবেরই নেতৃত্ব দেননি তিনি মার্কসবাদকেও বিকশিত করেন। লেনিন দেখান যে, পুঁজিবাদ এখন বার্ধক্যের যুগে প্রবেশ করেছে যে যুগ হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবের যুগ। এই যুগের মার্কসবাদই হচ্ছে লেনিনবাদ। ঐতিহাসিক কালপর্বের দিক দিয়ে আমরা এখনও লেনিনবাদের যুগেই বাস করছি। এত বছরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ এর মূল সূত্রসমূহ অভ্রান্ত বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিনকে নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর তত্ত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে লেনিনবাদকে রক্ষা করতে হয়েছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজকে এগিয়ে নিতে হয়েছে।

সমাজতন্ত্রের সাফল্য

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রথম থেকেই বিভিন্ন ধরনের সুবিধাবাদী, বিভ্রান্তিকর, হঠকারী ও অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। এতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন নিশ্চয়ই সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের মতবাদের ভিত্তিতে যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তাই–ই জয়ী হয়েছিল। এ বিজয় কেবল তত্ত্বের ক্ষেত্রেই নয়। বাস্তব জীবনেও বিজয় অর্জিত হয়েছিল। তিরিশের দশকের দিকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের মোটামুটি অবসান ঘটে। সোভিয়েত ইউনিয়নেই প্রথম প্রত্যেকটি মানুষের জন্য সমান শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা চালু হয়– যা আজও পর্যন্ত কোনো পুঁজিবাদী দেশে সম্ভব হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নেই প্রথম বেকারত্ব দূর হয়– যা কোন পুঁজিবাদী দেশের পক্ষে চিন্তা করাই সম্ভব নয়। তিরিশের দশকেই পাশ্চাত্যের তুলনায় একটি পশ্চাৎপদ দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর প্রথম সারির উন্নত দেশে রূপান্তরিত হয়। সেই সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবৃদ্ধির যে হার তা বিশ্বে রেকর্ড সৃষ্টিকারী। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এটা ছিল সেই সময়, যখন বাকি দুনিয়ার অর্থাৎ গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় চলছিল ইতিহাসের বৃহত্তম মন্দার যুগ। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে–

কি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কি মানবিক দৃষ্টিকোণ, যে কোন দিক দিয়েই সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের চেয়ে অনেক উন্নত এক সমাজব্যবস্থা।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃতিত্ব শুধু এইটুকুই নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নই মানবতার জঘন্যতম শত্রু ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করে মানবজাতিকে রক্ষা করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই একের পর এক পরাধীন দেশ মুক্তি অর্জন করতে শুরু করে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ ছিল বৃটেন, ফরাসী, জাপান, নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, স্পেন, জার্মান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কলোনী। কলোনীগুলোর মুক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের অবদান বিরাট।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পর যে দেশটি বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হয় তা হলো অত্যন্ত পশ্চাৎপদ এক দেশ–মঙ্গোলিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য নিয়ে আরও কয়টি দেশের অভ্যুদ্বয় ঘটে। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বৃহত্তম দেশ চীনসহ ভিয়েতনাম, কোরিয়া পূর্ব ইউরোপের অনেকগুলো দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় হয়। ষাটের দশকে কিউবায় সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় ঘটে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই দেশগুলো ছিল অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, শতাব্দীরও অধিককালব্যাপী উপনিবেশ বা আধা উপনিবেশ। পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একেবারে ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়। অথচ, সমাজতান্ত্রিক পথ ধরে এই দেশগুলো অতি অল্প সময়ে যে হারে উন্নয়ন করতে পেরেছে তা পুঁজিবাদী পথে কল্পনাও করা যায় না। এই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে শোষণের অবসান ঘটানো হয়েছে, বেকারত্ব দূর করা হয়েছে, সকল মানুষের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরবর্তীতে ষাটের ও সত্তরের দশকে কোনো কোনো পুঁজিবাদী দেশে (যাদেরকে ওয়েলফেয়ার স্টেট বলা হয়) যে কিছু কিছু সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে– তা সেইসব দেশের শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রভাবের কারণেই হয়েছে, একথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়। তৃতীয় বিশ্বের পুঁজিবাদী পথ অনুসারী কোনো দেশে এই ধরনের জনকল্যাণমূলক কোনো অবস্থার কোনো চিহ্নমাত্রও দেখা যাবে না। তৃতীয় বিশ্বের পুঁজিবাদী পথ অনুসারী দেশগুলোর সাধারণ চেহারাই হচ্ছে চরম দারিদ্র্য, অশিক্ষা, পুষ্টিহীনতা এবং মুষ্টিমেয় শোষক কর্তৃক ব্যাপক জনগণকে শোষণ, অত্যাচার ও লুণ্ঠন করা। তাই এটা ইতিহাস প্রমাণিত যে, সমাজতন্ত্র যে শুধু পুঁজিবাদ থেকে শ্রেষ্ঠ তাই–ই নয়, সমাজতন্ত্রই হচ্ছে মানুষের মুক্তির ও অগ্রগতির পথ।

কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভক্তি ও বিচ্যুতি

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিজয়ের যুগেও কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্য থেকেই বিভিন্ন ধরনের সংশোধনবাদী চিন্তাভাবনার উদয় হয়েছিল। যেমন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আর্ল

ব্রডার বিপ্লবের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের ধারণা তুলে ধরে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগামী অংশের পার্টি (ভ্যানগার্ড পার্টি)'র প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন। তিনি যুদ্ধকালীন চার মিত্র শক্তির মৈত্রী রক্ষা করার ওপর জোর দেন এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মীমাংসাহীন দ্বন্দ্বের দিকটি একেবারে উড়িয়ে দেন। সেদিন ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ডুকুসহ অনেক আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতা এই ধারণার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। পরবর্তীতেও এই ধরনের সংশোধনবাদী ধারণা নানারূপে বারে বারে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে এসেছে। বড় আকারে সংশোধনবাদী ধারণা উপস্থিত হলো CPSU-এর ২০ তম কংগ্রেস থেকে।

১৯৫৬ সালের CPSU-এর ২০ তম কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ স্তালিনের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে কেবলমাত্র মহান বিপ্লবী ও সমাজতন্ত্রের নির্মাতা স্তালিনেরই নয়, কমিউনিস্ট আন্দোলনেরই ভাবমূর্তি বিনষ্ট করেন। ক্রুশ্চেভ লেনিনীয় শান্তিপূর্ণ বির্বতনের ধারণা তুলে ধরেন। সেদিন CPSU-এর ২০ তম কংগ্রেসে উথাপিত ক্রুশ্চেভের রিপোর্ট সারা কমিউনিস্ট বিশ্বে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৪৩ সালেই তৃতীয় আন্তর্জাতিকের স্বেচ্ছাবিলুপ্তির পর কমিউনিস্টদের কোনো আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ছিল না। তাই মতাদর্শ বিষয়ের বিতর্ক নিরসনের জন্য ১৯৫৭ সালে মস্কোতে ৬৯টি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলন ডাকা হয়। সেখান থেকে ১২টি সমাজতান্ত্রিক দেশের পার্টির নামে একটি যৌথ বিবৃতি দেয়া হয়। এরপর আবার ১৯৬০ সালে ৮১ পার্টির সম্মেলন থেকে একটি দলিল প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ঐক্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ক্রুশ্চেভীয় সংশোধনবাদী নীতির প্রতিফলন পড়ে বিশ্ব রাজনীতিতে। ক্রুশ্চেভীয় সংশোধনবাদী লাইনের বিরোধিতা করে অনেকগুলো কমিউনিস্ট পার্টি। তার মধ্যে চীনের পার্টি ছিল প্রধান। ষাটের দশকের প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভক্তি দেখা দিল।

প্রথম দিকে চীনের পার্টি ক্রুশ্চেভীয় সংশোধনবাদী লাইনের বিরোধিতা করে জোরের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য তুলে ধরে এবং মার্কসবাদ লেনিনবাদের বিপ্লবী সত্তাকে রক্ষা করে। তবে পরবর্তীতে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় চীনের পার্টি অতিবাম বিচ্যুতির শিকার হয়। আরও পরে চীন নিজেও তার পূর্বতন অবস্থানে না থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মৈত্রীর ভূমিকা পালন করে। এই সময় চীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও পহেলা নম্বরের শত্রু বলে চিহ্নিত করে এবং ত্রিবিশ্ব তত্ত্ব নামে একটি ভুল ও বিপদজনক তত্ত্ব তুলে ধরে।

এটা দুঃখজনক যে, কমিউনিস্ট শিবিরের এই আদর্শগত বিভক্তি কেবলমাত্র মতাদর্শগত বিতর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও চীন ও আলবেনিয়ার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর (রুমানিয়া বাদে) সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। ভিয়েতনাম বিপ্লবের বিজয়ের অল্প পরেই চীন–ভিয়েতনামের

সীমান্ত সংঘর্ষ হয়। কম্পুচিয়া প্রশ্নেও চীন ও ভিয়েতনাম সরাসরি বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে। মতাদর্শগত প্রশ্নে দেশে দেশে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিসমূহে ভাঙন সৃষ্টি হয়। সমাজতান্ত্রিক শিবির ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভক্তি শ্রমজীবী মানুষের কখনই কাম্য নয়। বরং সংহতিই কাম্য।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র না থাকলেও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদকে খুব গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে। প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা হচ্ছে মার্কসবাদের অন্যতম মূল ভিত্তি–যাকে কোনো অবস্থাতেই হালকা করে দেখা ঠিক হবে না। অন্যদিকে আমাদের দেশসহ বিভিন্ন দেশের পার্টির মধ্যে মস্কো বা পিকিংকে অনুসরণ করার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তাকে আন্তর্জাতিকতা বলে না। বড়, ছোট, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বা ক্ষমতার বাইরে অবস্থিত সকল ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়া এবং কোনো ভুল চোখে পড়লে কমরেড সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমালোচনা তুলে ধরার নীতি হচ্ছে সঠিকনীতি।

এই সময়কালে যে মতাদর্শগত প্রশ্ন উথাপিত হয়েছিল সে সম্পর্কে আমার মতামত নিম্নরূপ ঃ

১· ক্রুশ্চেভীয় লাইন ছিল সংশোধনবাদী এবং সেই প্রসঙ্গে সোভিয়েত পার্টির কাছে লেখা চীনা পার্টির ১৯৬৩ সালের ১৪ জুলাই–এর চিঠির মর্মবস্তু মূলত সঠিক ছিল।

২· সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে অতিবাম বিচ্যুতি ছিল। চীনের সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্ব ও ত্রিবিশ্ব তত্ত্ব ভুল ছিল।

আত্মসমালোচনা

এই প্রসঙ্গে আমাদের কিছু আত্মসমালোচনাও আছে। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১· '৬০–এর দশকে ভিয়েতনামের বিপ্লবী সংগ্রামের তীব্রতা ও বিভিন্ন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের কারণে আমরা সেদিনের বিশ্ব বিপ্লবী পরিস্থিতিকে অতিরঞ্জিত করে দেখেছিলাম।

২· আমরা সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদকে খাটো করে দেখেছিলাম। "সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের বার্ধক্যের যুগ" লেনিনের এই কথাটিকে অনেকটা যান্ত্রিকভাবে বুঝেছিলাম। আমরা ধারণা করেছিলাম যে, পুঁজিবাদ বুঝি সামান্য ধাক্কাতেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

৩· আমরা আরও ধারণা করেছিলাম যে বস্তুগত উৎপাদনের দিক দিয়েও সমাজতন্ত্র শিগ্‌গিরই পুঁজিবাদকে ছাড়িয়ে যাবে, পুঁজিবাদ নিজেই এখন ধ্বংসের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং আধুনিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশকে পুঁজিবাদ কাজে লাগাতে পারে না, তা পারে কেবলমাত্র সমাজতন্ত্র। আমাদের এই ধারণার উৎস ছিল ৮১টি পার্টির দলিলের বক্তব্য। " Time is not far off when socialism's

share of world production will be greater than that of capitalism......capitalism will be defeted in the decisive sphere of human endeavour, the sphere of material production....... The word capitalism is going through an intense process of disintegration and decay....... Capitalism impedes more and more the achievements of modern-science and technology." এই বক্তব্যের মধ্যে সাধারণ সত্য থাকলেও, অতি সরলীকৃত আকারে পুঁজিবাদের সংকটকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে মনে হয় যে, পুঁজিবাদের আরও পতন হতে যাচ্ছে। এটা ভুল ছিল। পরবর্তীকালেও সোভিয়েত ও চীনসহ পৃথিবীর প্রায় সকল পার্টির বক্তব্যের মধ্যেও এই সুর বজায় ছিল। যদিও অন্যান্য বহু প্রশ্নে পরিষ্কার মত পার্থক্য তাদের মধ্যে ছিল।

কিন্তু বাস্তব ঘটনা ঘটেছে অন্যরকম। আশির দশকে এসে আমরা দেখলাম, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে। সোভিয়েতসহ কোনো কোনো দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ক্রমাগত সংকটের মধ্যে পড়ছে। তার কারণ আমরা পরে আলোচনা করব। অন্যদিকে '৬০–'৭০–এর দশকে যে প্রযুক্তিগত বিপ্লব সাধিত হয়েছিল, তাকে ধারণ করে পুঁজিবাদ নিজেকে শক্ত অবস্থানের ওপর দাঁড় করিয়েছে। মার্কস ও এঙ্গেলস বহুপূর্বেই কমিউনিস্ট ইশতেহারে বুর্জোয়াদের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন যা অন্য কোনো শোষক শ্রেণীর নেই– "The bourgoais cannot exist without constantly revolutionising the instruments of production and thereby the relations of production and with them whole relations of society."

আজ আমাদের আত্মসমালোচনা করে বলা দরকার যে, পুঁজিবাদকে জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের ঘাটতি ছিল।

৪· সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আমাদেরও ধারণা তেমন পরিষ্কার ছিল না। বিশেষ করে অনগ্রসর দেশসমূহে বিপ্লব উত্তরকালে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ যে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া সে সম্পর্কে আমরা তেমন সচেতন ছিলাম না। অনেক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল সরলীকৃত। কমিউনিস্ট সমাজে উত্তরণের লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণ প্রক্রিয়া যে অনেক চড়াই–উৎরাই আর আগু–পিছুর মধ্য দিয়ে একটি দীর্ঘ সময় ধরে চলবে, সে সম্পর্কেও আমাদের উপলব্ধিতে যথেষ্ট ঘাটতি ছিল।

৫· আমরা অনেকেই সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছি বহুবার কিন্তু সংশোধনবাদের বিপদ সম্পর্কে আমাদের প্রকৃত ধারণা ছিল না। আমরা বিশ্বাস করতাম, কোনো দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি একবার প্রতিষ্ঠিত হলে, সেখানে পুঁজিবাদের পুনঃআবির্ভাব সম্ভব নয়। আজ বাস্তব ঘটনা প্রমাণ করল, আমাদের ধারণা ভুল ছিল। লেনিন ও স্তালিনের বেশ কিছু লেখায় পুঁজিবাদের পুনরাবির্ভাবের বিপদ

সম্পর্কে সতর্কবাণী থাকা সত্ত্বেও আমরা সে সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না। সংশোধনবাদী নেতৃত্ব যে কোনো পার্টিকে কি পরিমাণে অধঃপতিত করতে পারে সে সম্পর্কেও আমাদের সম্যক ধারণা ছিল না। CPSU এর ২০তম কংগ্রেসের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের অধিকাংশ দেশে শাসক কমিউনিস্ট পার্টি সংশোধনবাদী পার্টিতে পরিনণত হয়। দীর্ঘকাল সংশোধনবাদী চর্চার ফলে পার্টির চরম অধঃপতন ও সবশেষে সমাজতন্ত্রেরও পতন ঘটেছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বিচ্যুতি

'৯০-এর শুরুতে ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে (আলবেনিয়া বাদে) শাসক পার্টির বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ চলতে থাকে যা গণবিস্ফোরণে পরিণত হয় এবং তারই পরিণতিতে এ দেশের ক্ষমতা থেকে কমিউনিস্ট পার্টি সরে যেতে বাধ্য হয়। অবশ্য রুমানিয়ার রক্তাক্ত ক্যু'দেতার মাধ্যমে চসেস্কু ও কমিউনিস্ট পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং এক প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে চসেস্কুকে হত্যা করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘটনা একটু অন্যরকমভাবে হয়েছে। বেশ কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে স্বয়ং পার্টি নেতা গর্বাচেভের নেতৃত্বেই কমিউনিস্ট পার্টির বিলুপ্তি ও সমাজতন্ত্রের পতন ঘটানো হয়েছে। তবে, সে-দেশেও পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জনগণের ব্যাপক বিক্ষোভ পরিচালিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের কারণসমূহ প্রায় একই রকম। সেগুলো হচ্ছে-

১· পার্টি নেতৃত্বের মতাদর্শগত বিচ্যুতি ও জনগণের মধ্যে অব্যাহতভাবে মতাদর্শগত চর্চারঅভাব।

২· দেশে ও সমাজে গণতন্ত্রের অভাব।

৩· পার্টি আমলাতন্ত্রের দাপট, পার্টি নেতৃত্বের দুর্নীতি ও গণবিচ্ছিন্নতা।

৪· অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে ত্রুটি।

এই সকল দেশে সমাজে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের চর্চা ছিল না। ছিল পার্টি আমলাতন্ত্রের দাপট। পার্টির মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা ছিল না। তার উপর দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল ফলে পার্টি নেতৃত্ব ও পার্টি আমলার বিরুদ্ধে জনগণের ক্রোধ ও ঘৃণা জয়লাভ করেছিল। পাশাপাশি বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল নতুন প্রজন্মের মানুষগুলো- যাদের বিপ্লবপূর্ব দুর্বিসহ অবস্থা সম্পর্কে কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না। এই নতুন প্রজন্ম পাশ্চাত্যের বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে আকৃষ্ট হয়েছে। সমাজতন্ত্র তাদের জীবনে কি বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে (শ্রেণী শোষণ নেই, মুদ্রাস্ফীতি নেই, খাওয়া-পরা, শিক্ষা, চিকিৎসার সমান সুযোগ ইত্যাদি) তা তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। অধঃপতিত পার্টি সমাজে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শগত শিক্ষা ও তার প্রচার করার কাজে মোটেই

মনোযোগী ছিল না। বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি দ্বারা প্রতিহত করা, জনগণের চেতনার মানকে উন্নততর আদর্শ ও সংস্কৃতি দ্বারা উন্নততর করার কাজ তারা করেন নি। এর পাশাপাশি বেশ কয়েকটি দেশে পার্টি অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আশির দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ কয়েকটি দেশে অর্থনৈতিক সংকটও সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো দেশে পার্টি সুদূরপ্রসারী অশুভ প্রতিক্রিয়ার দিকে নজর না দিয়ে তাৎক্ষণিক সংকট সমাধানের প্রচেষ্টায় একদিকে সীমিত আকারে ব্যক্তিমালিকানায় ফিরে যাবার উদ্যোগ নেয় এবং অপরদিকে পাশ্চাত্যের কাছে সাহায্যের হাত পাতে। তাতে সংকট অন্যদিক দিয়ে আরও বাড়তে থাকে। সব মিলিয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট চরম অবস্থায় পৌছায়। তারই সুযোগ নিয়ে কমিউনিস্ট বিরোধী শক্তি ও পার্টির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা সমাজতন্ত্র বিরোধী শক্তি একযোগে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল।

সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের জন্য আমরা প্রধানতঃ দায়ী করতে পারি পার্টির সংশোধনবাদী নেতৃত্বকে যারা প্রায় তিন দশক ধরে ক্রমাগত মার্কসবাদ–লেনিনবাদের বিপ্লবী মতাদর্শকে পরিত্যাগ করে সমাজতন্ত্রের ধ্বংস সাধন করেছে। ক্রুশ্চেভ আমল থেকেই আধুনিক সংশোধনবাদের উৎপত্তি। তখন থেকেই সোভিয়েত সমাজে ও পার্টিতে নৈতিক অধঃপতন শুরু হয়। গর্বাচেভের আমলে সংশোধনবাদের চরম পরিণতি ঘটে। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের ক্ষেত্রেও গর্বাচেভের ভূমিকাই বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত অক্টোবর বিপ্লব অমর হোক

মনজুরুল আহসান খান

শেষ পর্যন্ত যা ছিল শত্রুরও কল্পনাতীত, কিন্তু ইদানিং যা আশংকা করা হচ্ছিল তাই হ'ল। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হ'ল। পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্র। আমাদের এই গ্রহের ছয় ভাগের এক ভাগ জুড়ে ছিল যে দেশটি। যা ছিল বিশ্বের সব চাইতে শক্তিশালী দুই রাষ্ট্রের একটি। আর একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এখনও যাকে আমরা বলি আমেরিকা। সোভিয়েতের ভয়ে তটস্থ ছিল। সোভিয়েত সমরশক্তির বিপদের কথা বলে নিজের অকল্পনীয় সামরিক শক্তি গড়ে তুলেছিল। সারা বিশ্বজুড়ে ধনবান সামরিক শক্তির সাথে মৈত্রী গড়ে আর অসংখ্য সামরিক ঘাঁটি গেড়েও যে ভরসা পায় নি। নিরাপত্তার জন্য সে তারকা জগতেও তার সামরিক তৎপরতা বিস্তার করেছিল। সিনেমার তারকা নয়, তবে সিনেমার মতই মহাকাশে সে অস্ত্র সমাবেশ করেছে, সামরিক ঘাঁটি করেছে। তারকা যুদ্ধের কর্মসূচী নিয়েছে। কিন্তু কিছুই দরকার হ'ল না। একটি বুলেটও খরচা করতে হ'ল না। অন্ততঃ শেষ পর্যায়ে। আমেরিকার সেই প্রবল প্রতিপক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হ'ল। বিলুপ্ত কথাটা যেন ঘটনা ঠিক ঠিক প্রকাশ করতে পারছে না। বলা যায় উবে গেল। কর্পুর যেমন কঠিন পদার্থ থেকে সরাসরি বায়বীয় পদার্থে রূপান্তরিত হয়। কোন খোলা পাত্রে রাখলে চোখের সামনে যেমন শেষ হয়ে যায়, উবে যায় তেমনি। যেমন মার্কস–লেনিনের Withering away of the state, রাষ্ট্রের উবে যাওয়া, ঝরে যাওয়া। তবে অনেকগুলি রাষ্ট্র থাকল। সমাজতন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্য নিয়ে। এরা এখন মার্কিনীদের মিত্র।

সব গড়বড় করে দিয়ে গরবাচেভ পদত্যাগ করলেন। গরবাচেভ সাহস করে অনেক কিছু করেছেন, বলেছেনও। সাহস করে সত্য কথাটাও বলতে পারতেন। আসলে ত' তিনি পদত্যাগ করেননি। পদ তাকে ত্যাগ করেছে। আরও সঠিকভাবে বললে পদটাই ছিল না। রাষ্ট্র থাকলে ত' পদ থাকবে। পদ–ত্যাগের ঘোষণা দিয়ে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে গিয়ে গরবাচেভ দেখলেন তাকে আর প্রয়োজন নেই। নতুন কর্তরা নিজেরাই দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন। অফিসের রং–পাল্টে গেছে। পতাকা পাল্টেছে। 'গণতন্ত্রের' পতাকা, জারের পতাকা। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী গরবাচেভ না জানলেও যারা নতুন ক্ষমতায়

এসেছেন বা ক্ষমতা নিয়ে নিয়েছেন তারা 'বিপ্লব' কি করে করতে হয় তা জানেন। তারা অক্টোবর বিপ্লব থেকে শিখেছেন। লেনিন পড়েছেন। লেনিন বলেছেন বিপ্লবের সময় দ্বিধা সংকোচ করতে নেই। দৃঢ়তার সাথে, আদ্যন্তব্যাপী, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পন্ন করতে হয় বিপ্লব। আধ খেচড়াভাবে বিপ্লব হয় না। বিপ্লব নিয়ে খেলা করতে নেই। গরবাচেভ খেলতে পারেন, তারা খেলেননি। রাশিয়ার নতুন ক্ষমতাসীনদের তাত্ত্বিক যারা, মার্কিন বা ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায় এটাকে ত' একটা বিপ্লবই বলেছে। এই বিপ্লবে ত' তাদের আপত্তি নেই। ফরাসী বিপ্লবের স্বত্বাধিকার দাবি করতেও তাদের আপত্তি নেই। তার স্বপ্নটা না হোক ফলাফলটা। এর আগের বিপ্লব সম্পর্কেও নেই। সেসব বিপ্লবে যে রক্তপাত, হত্যা, ফাঁসি গিলোটিন হয়েছিল সেসব ত' স্বাভাবিক, অনিবার্য! মুর্খরাই এ নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

না, আপত্তি অক্টোবর বিপ্লব নিয়ে। কারণ সেই থেকে বিপ্লবের ক্ষেত্রে এক ব্যাতিক্রম শুরু হ'ল। দাস যুগে দাসরা বিদ্রোহ করেছিল। দাস ব্যবস্থার স্থান নিল সামন্ত ব্যবস্থা। ক্ষমতায় গেল দাসরা নয় সামন্ত প্রভুরা। দাসরা হ'ল ভূমিদাস, প্রজা, কৃষক। শোষণ চলতে থাকল আগের মতই। বরং বেশী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লবের The Declaration of the Rights of Man and Citizen. সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা সবার জন্য– নয় কার্যক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের, ধনীকদের অধিকার নিশ্চিত করল। আপামর জনগণের উপর শোষণ চলতেই থাকল।

কিন্তু অক্টোবর বিপ্লব এক শোষকের জায়গায় আর এক শোষককে ক্ষমতায় বসায় নি। অক্টোবর বিপ্লব শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছিল। এই বিপ্লব সারা বিশ্বের শোষণ ব্যবস্থায় চিড় ধরিয়েছিল। সারা বিশ্বে লক্ষ কোটি মানুষকে শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের অকুতভয় সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিল। সে পথ ধরে বেশ কিছু দেশে এমনি নতুন ধরনের বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। ১৯১৭ সনের ২৫ অক্টোবর (নতুন ক্যালেন্ডার অনুসারে ৭ নভেম্বর) যে নতুন ধরনের বিপ্লব হয়েছিল তা সম্পন্ন করতে বিশ্বের তাবৎ বিপ্লবের কোনটিরই মত রক্তপাত করতে হয় নি। ব্যাপক জনতার স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় সমর্থনে সে বিপ্লব হয়েছিল শান্তিপূর্ণ ও রক্তপাতহীন। তাও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি তাকে ছাড়ে নি। বিপদ তারা ঠিকই বুঝেছিল। তাই বিপ্লবকে হত্যা করার জন্য তারা প্রকাশ্যেই হামলা করেছিল। রক্তপাত হয়েছিল তখনই।

অক্টোবর বিপ্লব রাষ্ট্র ও প্রশাসন সম্পর্কে ধারণাই পাল্টে দিয়েছিল। শ্রমিক, কৃষক, মুটে, মজুর, কুলি, বাবুর্চি সাধারণ মানুষ যারা চিরকাল শাসিত হয়েছে, হুকুম তামিল করেছে তারা কি কখনও দেশ চালাতে পারে? হ্যাঁ পেরেছিল। শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে পেরেছিল এবং ভালই পেরেছিল। একটি পশ্চাৎপদ বিধ্বস্ত দেশকে স্বল্প সময়ে এক পরাশক্তিতে পরিণত করেছিল। সেই সাধারণ মানুষগুলি কিভাবে

দেশের হাল ধরেছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী প্রাণবন্ত বিবরণ পাওয়া যাবে মার্কিন সাংবাদিক জন রীডের 'দুনিয়া কাঁপানো দশদিন' বইটিতে। অক্টোবর বিপ্লব শুধু মাত্র ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল না। বিপ্লবের শ্লোগান ছিল শান্তি, রুটি, জমি। বলশেভিক পার্টি সেদিন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে সমগ্র জনগণের শান্তির জন্য সংগ্রাম, জমিদারদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে কৃষকের জমির জন্য সংগ্রাম, 'জাতিসমূহের কারাগার' বলে কুখ্যাত বিশাল রুশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মুক্তি সংগ্রাম এবং রুটি, রুজি ও সমাজতন্ত্রের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামকে এক গণবিপ্লবের স্রোতধারায় মিলিত করতে পেরেছিল। এই বিপ্লব ছিল এইসব বিভিন্ন গণ সংগ্রামের পুঞ্জীভূত ফল।

বিপ্লবের পর পরই জাতিসমূহের অধিকার সংক্রান্ত ডিক্রি জারি করা হয়। এতে দেশের প্রতিটি জাতির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নিশ্চয়তা এবং প্রাচ্যের মুসলিমদের প্রতি এক আহবানে বিপ্লবী সরকার মুসলিমদের জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের অলংঘনীয়তা এবং নিজেদের জীবন ধারা গড়ে তোলার পূর্ণ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। ফিনল্যাণ্ড, উক্রাইন, পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়া হয়। তখন অবশ্য সাম্রাজ্যবাদীরা প্রচার চালিয়ে ছিল বলশেভিকরা জারের বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। এখন অবশ্য উল্টো তারা অভিনন্দন জানাচ্ছে। উল্টোই বা বলব কেন। তখনও ধনীকদের শ্রেণী স্বার্থেই করেছে, এখনও তা করছে তাদের শ্রেণী স্বার্থেই।

বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে অবশ্য সেদিন সরকারের মধ্যে থেকে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু না অন্যের মত এই বিপ্লব ঘোষিত নীতি ও বাস্তব কাজের মধ্যে তফাৎ করতে রাজি হয় নি। ফিনল্যাণ্ডের কমিউনিস্টরাও আপত্তি তুলেছিল। বিচ্ছিন্ন হ'লে ফিনল্যাণ্ডের প্রগতিশীলদের উপর বুর্জোয়া শাসকদের নির্যাতন নেমে আসার বিপদ ছিল। কিন্তু বিপ্লবী সরকার ঘোষিত নীতি থেকে বিচ্যুত হয় নি। লেনিন সতর্ক করে দিয়েছিলেন-- "বিভিন্ন জাতির ব্যাপারে আমাদেরকে অবশ্যই বিশেষভাবে সতর্ক হতে হবে, কারণ জাতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক অবিশ্বাসের চাইতে খারাপ কিছু নেই।"

পরবর্তীকালে বিপ্লবী সরকারের কাজ দেখে যে বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল তাকেই অবলম্বন করে ১৯২২ সনে স্বেচ্ছায়, বিচ্ছিন্ন হওয়াসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বজায় রেখেই ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক গঠিত হয়। সংবিধানের ২৭ ধারায় বলা ছিল 'প্রতিটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র ইউএসএসআর থেকে অবাধে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার বজায় রাখবে।'

এই অধিকারই প্রয়োগ করা হয়েছে আসলেই অবাধে। বিশ্বের আর কোথাও এমনিভাবে কেউ স্বাধীন বা বিচ্ছিন্ন হতে পেরেছে বলে মনে হয় না। পাকিস্তান, ভারত

বা বার্মায় যদি বাস্তবে এমনি অবাধ অধিকার থাকত তা'হলে বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ, উভয় কাশ্মীর, পাঞ্জাব, আসাম, আরাকান প্রভৃতি এলাকায় কি তুলকালাম কাণ্ড ঘটত কে জানে! কিন্তু বিপ্লব শুধু বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারের কথাই বলেনি। স্বেচ্ছায় সমতার ভিত্তিতে ঐক্যের কথাও বলেছিল। তালাকের অধিকার থাকা মানে তালাক সব সময় যুক্তিযুক্ত সঠিক এমন নয়। তাহলে কি লেনিনের সতর্কবাণী তারা বিস্মৃত হয়েছিল? "জাতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক অবিশ্বাসের চাইতে খারাপ কিছুই নেই।" ঘটনাবলী ক্রমে সেই খারাপের দিকেই গিয়েছে। স্বেচ্ছায় ঐক্য অনিচ্ছার ঐক্যে পরিণত হয়েছে।

যে বিপ্লব জাতিগুলিকে বন্দীশালা থেকে মুক্তি দিয়েছিল, বিশ্বের নিপিড়ীত জাতিসমূহকে মুক্তি সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিল, স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে জাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করেছিল, পশ্চাৎপদ এমনকি লিখিত বর্ণমালাবিহীন জাতি ও জাতীয় সংখ্যালঘুদের উন্নত আধুনিক স্তরে উন্নীত করেছিল সেই বিপ্লবকে ধীরে ধীরে ভেতরে থেকে, বাইরে থেকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হ'ল। সমাজতন্ত্রের জায়গায় আমলাতন্ত্র কায়েম হল।

১৯২০ সালে পার্টি সভ্যপদ ৬১,১০০-এ উঠলে লেনিন পার্টির সভ্যসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন-----"ক্যারিয়ারিস্ট এবং ভণ্ড যাদের শুধু গুলি করে হত্যা করাই উচিত তারা ক্ষমতাসীন পার্টিতে অনুপ্রবেশ করতে পারে।" ১৯২২ সালে লেনিন বলেন, "ক্ষমতাসীন একটি পার্টি তার নিজের ইতরদের যখন রক্ষা করে তখন তা খুবই বেদনাদায়ক এবং লজ্জাজনক।" লেনিন বিচার মন্ত্রণালয়কে এসব অপরাধিদের ক্ষেত্রে শাস্তি যেন আরও কঠোর হয় তার নির্দেশ দিতে বলেছিলেন। এর পর সত্তর বছর কেটে গেছে। পার্টি সভ্যসংখ্যা প্রায় পৌনে দু'কোটিতে দাঁড়িয়েছে। এরা কমিউনিজমের প্রতি কতখানি আকৃষ্ট আর ক্ষমতার প্রতি কতটা সেটাই প্রশ্ন।

এই পার্টির হাতেই ছিল ক্ষমতা। অথচ বিপ্লবের সময় বলশেভিক পার্টি পার্টির হাতে ক্ষমতার শ্লোগান তোলেনি। সকল ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে তুলে দেওয়ার শ্লোগানই তুলেছিল বলশেভিকরা। সোভিয়েতগুলি বলশেভিকদের পরিকল্পনা অনুসারে বা লেনিনের নির্দেশ অনুসারে জন্মায় নি। গণবিপ্লবের সময় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীল বিপ্লবী ক্ষমতার আধার হিসেবে শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি গড়ে উঠেছিল। বলশেভিকরা সেই প্রকৃত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার দাবীই তুলেছিল।

মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন কেউই কখনও এক পার্টি ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের অঙ্গ একথা বলেন নি। অক্টোবর বিপ্লবে বলশেভিকরা অন্য দলকেও মিত্র হিসেবে নিয়ে ছিলেন। নির্দলীয় অনেকও সঙ্গে ছিলেন। বিভিন্ন মত ও চিন্তার নেতা ও কর্মীদের নিয়ে

পার্টির ঐক্য গড়ে উঠেছিল। লেনিনের পার্টি, নেতৃত্ব দিতে পেরেছিল কারণ তারা এদের সবার আবেগ, আকাংখাকে ধারণ করতে পেরেছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় কৃষক ম্যাণ্ডেটের কথা। সোশ্যালিস্ট রেভোলিউশনারীদের নেতৃত্ব এটা প্রণয়ন করেছিল এবং বলশেভিকরা এর সমালোচনা করেছিল। কিন্তু বিপ্লবের পর ২৬ অক্টোবর ভূমি বিষয়ক ডিক্রিতে এটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। লেনিন বলেন, "গণতান্ত্রিক সরকার হিসেবে আমরা সাধারণ মানুষের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করতে পারি না– যদিও তার সাথে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে। অভিজ্ঞতার আগুনে, কর্মক্ষেত্রে ডিক্রী প্রয়োগ করে এবং স্থানীয়ভাবে তা পালন করতে গিয়ে কৃষকরা নিজেরাই বুঝবে সত্য কোথায়। ⋯ সেরা শিক্ষক হল জীবন, জীবনই শেখাবে কে ঠিক, ⋯ জনগণের সৃজনোদ্যোগের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আমাদেরদিতেহবে।"

দাসদের অধিকার দেওয়া হয় নি। গণতন্ত্র ছিল কেবল দাস–মালিকদের জন্যে। এর পর সবসময় গণতন্ত্র শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করেছে। কোন সময় সামন্ত ভূস্বামীদের, কোন সময় বুর্জোয়াদের। এরা ছিল সংখ্যালঘু। রুশ বিপ্লব সর্ব প্রথম সংখ্যাগুরুদের জন্যে গণতন্ত্র কায়েম করে। কিন্তু বিপ্লবের নেতারা কোন কথা গোপন করে নি। কোন ভাওতা দেয় নি। তারা খোলাখুলি বলেছিল শ্রমিক, কৃষক ব্যাপক জনগণের জন্যে গণতন্ত্র হলেও বুর্জোয়া ও শোষকদের জন্যে তা হবে একনায়কত্ব–সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব। "গণতান্ত্রিকতার বিপুল প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, এই সর্ব প্রথম যে গণতান্ত্রিকতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ধনীদের জন্য নয়, গরীবদের জন্যে।" কিন্তু পরবর্তীতে বাস্তবে জনগণের একনায়কত্বের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হলো অনেকটা এক পর্টির একনায়কত্ব। বস্তুতঃ মুষ্টিমেয়দের একনায়কত্ব।

অথচ লেনিন তার রাষ্ট্র বিপ্লব বইটিতে– যেটি তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন বিপ্লবের আগে, বিপ্লব শুরু হয়ে যাওয়ার আনন্দে লেখা স্থগিত করেছিলেন, শেষ করেছিলেন বিপ্লবের পরে– বলেছিলেন, "কেবল কমিউনিস্ট সমাজে পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ যখন চূড়ান্তরূপেই চূর্ণ, পুঁজিপতিরা যখন বিলুপ্ত, যখন শ্রেণী আর নেই (অর্থাৎ উৎপাদনের সামাজিক উপায়ের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে সমাজ সভ্যদের কোন প্রভেদ নেই) মাত্র তখনই 'রাষ্ট্র লোপ পায় ও স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হয়'। কেবল তখনই সত্যসত্যই পরিপূর্ণ, সত্যসত্য সার্বিক ব্যতয় ছাড়া গণতন্ত্র সম্ভবপর এবং তা কার্যকরী হবে। এবং কেবল তখনই গণতন্ত্র (অর্থাৎ রাষ্ট্র––লেখক) শুকিয়ে মরতে শুরু করে নিতান্ত এই ঘটনা চক্রের জন্য যে, পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে, পুঁজিবাদী শোষণের অসংখ্য বীভৎসতা, বন্যতা, উদ্ভটতা ও জঘন্যতা থেকে মুক্ত লোকেরা, যুগ যুগ ধরে জ্ঞাত এবং হাজার হাজার বছর ধরে সমস্ত হিতোপদেশে পুনরুক্ত সমাজ জীবনের প্রাথমিক নিয়মগুলি পালনে অভ্যস্ত হবে, তা পালনে অভ্যস্ত হবে বিনা জবরদস্তিতে, বিনা বাধ্যকতায়, বিনা আজ্ঞাহীনতায়, বাধ্য করার সেই বিশেষ যন্ত্রটি ছাড়াই, যাকে

বলা হয় রাষ্ট্র"। সর্বহারার একনায়কত্বের মধ্য দিয়ে সমাজের সবার জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্র নামক পীড়নের যন্ত্রটিকেই বিলুপ্ত করার লক্ষ্য নিয়ে যে বিপ্লব সূচিত হয়েছিল, নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তা জন্ম দিল এক বিশাল রাষ্ট্র যন্ত্রের, এক সুবিপুল আমলাতন্ত্রের- এক সুবিধাভোগী কায়েমী স্বার্থ—(Over class) গড়ে উঠল। সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা পর্যবসিত হল পার্টির হাতে সমস্ত ক্ষমতায়, সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব রূপান্তরিত হল পার্টির মুষ্টিমেয় নেতা ও আমলাদের একনায়কত্বে। জাতিসমূহের স্বেচ্ছা ঐক্যের স্থান নিল অনিচ্ছা ও অবিশ্বাস। এ সবেরেই পুঞ্জিভূত ফল সোভিয়েতের বিলুপ্তি, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়। অক্টোবর বিপ্লবের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য নয়, অক্টোবর বিপ্লবের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই এই বিলুপ্তি, এইবিপর্যয়।

তারপর কি? আমি বলব তারপর আরও অক্টোবর বিপ্লব। এখনকার মত করে। পরাজয় হয়েছে বলেকি বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করতে হবে? কত হাজার দাস বিদ্রোহ পরাভূত হয়েছে! কত সহস্র স্পার্টাকাসকে হত্যা করা হয়েছে! প্যারী কমিউনসহ কত বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে! শোষণ নিপীড়ন, বর্বরতার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের লক্ষ বছরের সংগ্রামে পরাজয় তার সংগ্রামকে কোন দিন বন্ধ করতে পারেনি। আমাদের দেশে শিল্পী এস· এম· সুলতানের তুলিতে তাই বুঝি আমাদের দেশের শীর্ণকায় কিষাণ-কিষাণী ধরা দেয় পেশীবহুল, সুঠাম দেহী শক্তিশালী মানুষ হিসেবে। দুর্যোগ ও সংকট মোকাবেলায় যে শাশ্বত মানুষ প্রতিদিন জীবনকে এগিয়ে নিচ্ছে, সে পরাজয় মানে না।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

"যে পক্ষের পরাজয় সে পক্ষ ত্যজিতে কোরো না আহবান।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে,
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে আয়ি,
বীরের সদগতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।"

আমাদের দেশের এক নবীন কবির ভাষায় বলতে চাই ঃ

"যে পতাকার জন্য জীবন দিয়েছে লাখো কমরেড, বন্ধু আমার।
যে পতাকার স্বপ্নে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে মেহনতী মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, স্বপ্নকামী নারী।
....পশুরা বিশ্বজয়ের উল্লাসে নৃত্য করুক।
আমি কখোনই পশু হব না।
শুধু যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ তুলে ধরব উর্ধ্বপানে
শোষিতের মুক্তি পতাকা। কমিউনিজমের পতাকা।"

অক্টোবর বিপ্লব অমর হোক।

কমিউনিজম শেষ, সাম্রাজ্যবাদ–পুজিবাদের এই রায় ইতিহাস প্রত্যাখান করবে

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে। সে দেশে সমাজতন্ত্র আর টিকে নেই। এসব ঘটনা প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী–পুঁজিবাদী মহল রায় ঘোষণা করেছে যে, কমিউনিজম শেষ। তাদের দেয়া রায় যাতে সবাই মেনে নিতে বাধ্য হয় সেজন্যে তারা তাদের সবরকম মজুদ শক্তি –সামর্থ্য ও কলাকৌশলকে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে নিয়োজিত করেছে। হুমকি, ব্ল্যাকমেইল, চাপ প্রয়োগ, অন্তর্ঘাত, বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের ধূম্রজাল সৃষ্টির কোনো পথ ও পন্থাই তারা বাদ রাখছে না। তাদের কর্তৃত্ববাদী মনোভাব ও আচরণ গোপন রাখাও এখন তারা প্রয়োজন মনে করছে না। সমস্ত পরিকল্পনার অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে তারা বিশ্বব্যাপী প্রচার মাধ্যমের উপর তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণকে ব্যবহার করে কমিউনিজম শেষ, সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত পতন হয়েছে মর্মে তাদের "রায়"কে প্রশ্নাতীত করে তোলার জন্যে চতুর্দিক থেকে সোরগোল তুলেছে।

সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের ঘোষিত এই রায় কখনই কার্যকর হবে না। একটি খণ্ডযুদ্ধের ফলাফল দিয়েই 'যুদ্ধের শেষ পরিণতি' নির্ধারিত হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতন মানব সভ্যতার সমাজতন্ত্র সাম্যবাদ অভিমুখী অগ্রযাত্রার অমোঘ গতির সমাপ্তি নির্দেশ করে না। তা এই মহাযাত্রা পথে একটি হোচট খাবার (খুব বড় রকমের হোচট বটে) ব্যাপার মাত্র।

সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের মুখেও আমি সমাজতন্ত্র – সাম্যবাদের অমোঘ অগ্রযাত্রা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত নই। সমাজতন্ত্র–সাম্যবাদের প্রতি আমার আনুগত্য একান্তই আমার নিজস্ব বুদ্ধি–বিবেচনা–জ্ঞাননির্ভর। বাংলাদেশের বাস্তবতা ও বিশ্বের বাস্তবতা এবং ইতিহাসের গতি ধারা বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করেই আমি এই মহতী আদর্শের অনুসারী হয়েছি।

তত্ত্ব ও প্রয়োগের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে মার্কসবাদের প্রতিপাদ্যটিকে সরলভাবে বুঝে নিয়ে একথা কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে ৭০ বছর সমাজতন্ত্র নির্মাণের পর সোভিয়েত দেশে তা যদি এভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে কি ইতিহাসে প্রয়োগের

প্রমাণ দ্বারা একথাই নির্ধারিত হয় না যে, সমাজতন্ত্র ভুল, তা ইতিহাসের একটি বিকৃতি এবং তা মার্কসীয় সূত্রানুসারেই পরিত্যাজ্য? এই যুক্তি নিতান্তই ভ্রান্ত। কেননা, মানব সমাজের বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দিয়ে উপসংহার টানার জন্যে ৭০ বছর খুবই স্বল্প কাল পর্ব। ইতিহাসে সমাজব্যবস্থার ধারাবাহিক বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই? প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থাগুলোর কথা বাদই দিলাম। সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর অনেক দেশ আবার সামন্ত ব্যবস্থায় ফিরে গেছে। ফরাসী দেশে বুর্জোয়া বিপ্লব সফল হয়ে আবার পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছে। সামন্ত ব্যবস্থা আবার সাময়িকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নতুন করে আবার বিপ্লব সম্পাদন করতে হয়েছে। উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই ঘটেছে ইতিহাসে এক সমাজব্যবস্থা থেকে অন্যতে উত্তরণ। এক 'খন্ড যুদ্ধের ফলাফল' দ্বারাই 'যুদ্ধের শেষ পরিণতি' নির্ধারিত হয়নি।

যে কোনো পক্ষপাতহীন বস্তুনিষ্ঠ বিবেচনা থেকে এ কথা স্পষ্টই বলা যায় যে সোভিয়েতে ৭০ বছরের সমাজতন্ত্রের ইতিহাস বহুক্ষেত্রেই পুঁজিবাদের চেয়ে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। শতাব্দীর শুরুতে যে দেশ ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পশ্চাদপদ, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক পথ গ্রহণের ফলেই আজ নানা সমস্যা সত্ত্বেও পৃথিবীর অন্যতম শক্তিধর ও উন্নত রাষ্ট্র হয়ে উঠতে পেরেছিল। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব না থাকলে আজ আমরা যে বিশ্বকে দেখতে পাচ্ছি তা কি দেখতে পাওয়া সম্ভব হতো? উপনিবেশের শৃংখল ভেঙ্গে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম কি বিজয় লাভ করতে পারতো? ফ্যাসিবাদের হাত থেকে বিশ্ব মানবতাকে রক্ষা করা যেতো? বাংলাদেশকে কি আমরা স্বাধীন করতে পরতাম? পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই কি সমাজতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে তার বর্তমান রূপ গ্রহণ করতে পারতো? এসব বিষয়ে পরিস্থিতি কি হতে পারতো তা কল্পনা করতে যদি কষ্ট হয় তাহলে আমি বলবো যে, এখন, সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংস ও তার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পরে সে দেশে যে সব গভীর সংকট ও বিপর্যয় সমাজতন্ত্র পরিত্যাগের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এবং সব কিছুর ফলাফল হিসেবে এখন আমরা বিশ্ব পরিস্থিতির কি পরিণাম অনুমান করতে পারি সে বিষয়ে একটু ভাবতে। আমেরিকার একক কর্তৃত্বে এবং সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণে তৃতীয় বিশ্বের পশ্চাদপদ দেশগুলোর অবস্থা কি দাঁড়াবে? পুঁজিবাদী বিশ্বের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলো বিশ্বকে কোন অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেবে? ইতিমধ্যেই কি আমেরিকা ও সাম্রাজ্যবাদের ঔদ্ধত্বপূর্ণ আচরণ থেকে অবস্থাটা অনুমান করা যাচ্ছে না?

বিশ্বের দেশে দেশে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রকামী বাম শক্তি নানা ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও অনন্য ভূমিকা ও অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশে তাদের অমূল্য অবদান অনস্বীকার্য। এদেশে কমিউনিস্ট ও বামশক্তির বর্ধিত ভূমিকার তাগিদ

সামাজিক বাস্তবতার কারণে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের আন্দোলন ও সংগঠন হাওয়ার ওপর গড়ে উঠেনি, তার শিকড় জাতীয় ও বিশ্ব বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত।

তাই বলতে চাই যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের যে বিপর্যয় ঘটে গেল এটা দেখেই মানব সভ্যতার ইতিহাসের ধারা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করে বলে দেয়া যায় না যে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই ইতিহাসের শেষ পরিণতি। পক্ষান্তরে এটা দৃঢ়ভাবেই আমি মনে করি যে সভ্যতার পরিণতি কখনোই পুঁজিবাদ হতে পারবে না। পুঁজিবাদের অমানবিকতা ও তার অন্তর্নিহিত অসংগতির ফলেই সভ্যতার অগ্রগতির স্বার্থে সে পুঁজিবাদের নেতিকরণ অনিবার্য করে তুলবে। পুঁজিবাদের অমানবিকতা ও মৌলিক অসংগতির নেতিকরণের সচেতন বিপ্লবী প্রয়াসই হলো সমাজতন্ত্র। তাই সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই যে, হোঁচট-ধাক্কা কাটিয়ে উঠে এগিয়ে যাবে সমাজতন্ত্রের পথে সভ্যতার দৃপ্ত পদযাত্রা।

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্র–সাম্যবাদের দিকে অগ্রযাত্রার তাগিদটি সমাজে সৃষ্টি হয়ে রয়েছে কারো ইচ্ছাশক্তি অথবা কোনো মহামনীষীর তত্ত্বের শক্তি বলে নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বাস্তব অসংগতিপূর্ণ মৌল বৈশিষ্টের কারণেই। মানুষ মাত্রই 'মুক্ত মানব' হতে চায়। এটা তার অনন্ত প্রয়াস। মানব বৈশিষ্টই তার মধ্যে এজন্য নিরন্তর তাগিদের জন্ম দেয়। কিন্তু যুগ যুগ ধরে চলে আসা নানা সমাজ ব্যবস্থায় সে মুক্ত মানব হওয়ার জন্য তার এই প্রয়াসকে ধাপে ধাপে অগ্রসর করতে পারলেও তাকে পূর্ণ করতে পারেনি। মানব বৈশিষ্ট্য থেকে কোনো না কোনোভাবে তার বিচ্ছিন্নতা (Alienation) থেকেই গেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে সে এই বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত হতে পারে না, কারণ এই বিচ্ছিন্নতার উপাদান পুঁজিবাদের মৌল বৈশিষ্ট্যজাত। এই ব্যবস্থার অসংগতি হলো এখানেই যে– যে সমাজ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট ও লালিত, মানুষই হয়ে পড়ে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, পদানত। অর্থনীতির ক্ষেত্রে শোষণ হয় এই ব্যবস্থার ভিত্তি। সম্পদ সৃষ্টিকারী মানুষ হয়ে পড়ে তার নিজের শ্রমশক্তি ও সৃষ্ট সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতার প্রতিফলন সর্বক্ষেত্রেই বিরাজ করতে থাকে। সাংস্কৃতিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক তথা সব ক্ষেত্রেই। উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান সামাজিকীকরণের প্রবণতার সাথে সম্পদের ব্যক্তিগত আহরণের দ্বন্দ্ব অব্যাহতই থাকে। এভাবে বিরাজমান হয়ে থাকে সংকট–সংঘাতের ভিত্তি। তাই, পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সমাজ মানবমুক্তি ঘটাতে পারে না।

মুক্ত মানবের মুক্ত সমাজের নামই হলো সাম্যবাদ। সেই সমাজ প্রতিষ্ঠার সচেতন প্রয়াসই হলো সমাজতন্ত্র, যা আসলে সাম্যবাদে উত্তরণের জন্যে অন্তর্বর্তীকালীন প্রক্রিয়া। মার্কসবাদ হলো সভ্যতার এই ঐতিহাসিক রূপান্তরের সচেতনতা। এই বিপ্লবী প্রয়াসের মতাদর্শ। মার্কসবাদের সৃজনশীল মতাদর্শটি বাস্তব, সত্য ও জীবন্ত–সে কারণেই তা মানব মুক্তির মতাদর্শগত ভিত্তি হতে পেরেছে।

এই অনুসিদ্ধান্তগুলোকে ভিত্তি করেই ১৯১৭ সালে সোভিয়েত দেশে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছিল। কিন্তু আজ যা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তারচেয়ে বড় কথা, যে প্রশ্নের জবাব খোঁজা আজ অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হলো, সোভিয়েত দেশে এতো বছর পরে সেই সমাজতন্ত্রেরই বিপর্যয় ঘটলো কেন? এর পেছনে কি রয়েছে মতবাদেরই কোনো ভ্রান্তি? সমাজতন্ত্রের প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভ্রান্তিই যদি এর কারণ হয়ে থাকে, তাহলে সেই ভ্রান্তি ছিল কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে? নাকি তা মতবাদটি উপলব্ধির ক্ষেত্রে কোনো গুরুতর ত্রুটি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভ্রান্তি?

এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে প্রথমেই ফিরে যেতে হয় মার্কসবাদের মর্মবাণী ও তার স্বরূপ এবং সমাজতন্ত্র–সাম্যবাদের ধারণার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর দিকে। আমার মতে মার্কসবাদ–সমাজতন্ত্র–সাম্যবাদ সম্পর্কে কতকগুলো মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুতর কতকগুলো ত্রুটির ফলেই আজকের বিপর্যয়ের পটভূমি রচিত হয়েছে। এর শুরু মূলতঃ স্ট্যালিনের আমল থেকে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, মার্কসবাদের অন্তর্নিহিত সজীবতা ও সৃজনশীলতার মর্মকথাটি ক্ষমাহীনভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। দোষ কার্ল মার্কসের নয়, দোষ মার্কসবাদের অনুসারীদের। মার্কসবাদকে পরম সত্য ধারণকারী শাস্ত্রবদ্ধ কেতাবী মতবাদে পরিণত করা হয়েছিল। মার্কসবাদী মতাদর্শ এ ধরনের চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ মার্কসবাদকে সেরূপ বিকৃতির শিকারে পরিণত করা হয়েছে। ট্র্যাজেডি এখানেই যে, যেই 'মতান্ধতার' ধারণাকে মার্কসবাদ নাকচ করেছে, তারই শিকার হয়েছে সে। ভাবনাটা এভাবেই দাঁড়িয়েছিল যে তত্ত্ব চর্চার ইতি মার্কসের সাথে সাথেই ঘটেছে (অবশ্য কেউ কেউ তা কিছুটা বর্ধিত করে লেনিন, স্ট্যালিন ও মাও পর্যন্ত স্বীকার করেছেন)। অথচ মার্কস তত্ত্ব ও প্রয়োগের আন্তঃসম্পর্কের বিশ্লেষণ করে এটাই তুলে ধরেছিলেন যে, যেহেতু প্রয়োগ অনন্ত বিকাশমান এবং যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্ত বিকাশমান ও সে সম্পর্কে লব্ধ জ্ঞান কখনই পুর্ণ হয়ে উঠতে পারে না, তাই তত্ত্বও অনন্ত বিকাশমান হতে বাধ্য। মার্কসবাদের এই মর্ম কথাটি অনুধাবনের কাজটি অবহেলিত থেকেছে। সমস্যার উৎপত্তির একটি বড় কারণ এখান থেকেই। অন্যদিকে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সহজ–সরল মডেল ভিত্তিক ধারণা অনুসরণ করা হয়েছিল। সেটা এক কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক মডেল। সব দেশেই সাধারণভাবে সেই একই মডেল ধরে সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য চেষ্টা হয়েছে। সেই মডেলকেই স্থান–কালের বিবেচনার উর্ধ্বে সাধারণভাবে পরম সত্য বলে জ্ঞান করা হয়েছে। আসলে, সমাজতন্ত্র যে কোন 'স্থিতিশীল অবস্থার সমাবেশ' নয়, বরঞ্চ সাম্যবাদী সভ্যতার পথে অগ্রসর হওয়ার একটি প্রক্রিয়া সে কথাটি মনে রাখা হয় নি। ফলে চলমান বহিঃস্থ ও অভ্যান্তরীণ ঘটনা প্রবাহের ধারায় সমাজতন্ত্র বিনির্মাণের ধারাকে ক্রমাগত নবায়ন করার কাজটি অবহেলিত থেকেছে। এর ফলেই জমে উঠেছে নানা সমস্যার ভিত্তি।

মনে করা হয়েছিল যে, সমাজতন্ত্র সব সমস্যার ম্যাজিক সমাধান দেবে। কিন্তু এ কথা মনে রাখা হয়নি যে সমাজতন্ত্র সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে মাত্র, সমস্যা সমাধানের কোন অটোমেটিক নিশ্চয়তা দেয় না। প্রতিটি নির্দিষ্ট মূহুর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে সমস্যা আপনা আপনি সমাধান হয় না, বরঞ্চ নতুন সমস্যার জন্মদেয়।

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কতগুলো ভুল ধারণা অনেক সমস্যার জন্ম দিয়েছে। মনে করা হয়েছে যে গণতন্ত্র, মানবতা এগুলো বুর্জোয়াদের ব্যাপার। অথচ ইতিহাস এ সাক্ষ্যই দেয় যে এগুলো সাধারণ মেহনতি মানুষেরাই লড়াই করে প্রতিষ্ঠা করেছে, কেবল বুর্জোয়ারা নয়; এগুলো সভ্যতার সঞ্চয়, বুর্জোয়াদের সম্পদ নয়। অথচ সমাজতন্ত্রকে এসবের প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখানোর জন্য বুর্জোয়া প্রচারযন্ত্র যে ক্রমাগত প্রচার চালিয়েছে সমাজতন্ত্রীরা তা স্বীকার করে নিয়ে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়াল মেরেছে। আসলে গণতন্ত্রের বিভিন্ন অধিকারগুলো (forms) সভ্যতার সম্পদরূপে ধারণ করে তাকে সমাজতান্ত্রিক আধেয় (content) দেয়ার জন্য অগ্রসর হওয়া উচিৎ ছিল। মানুষের ব্যক্তি সত্তাকে অবহেলা করে (এটাকে বুর্জোয়াদের ব্যাপার বলে তাচ্ছিল্য করে) সামাজিক সত্তাকে পরম জ্ঞান করা হয়েছিল। অথচ মার্কস তাঁর মতবাদ 'মুক্ত মানব'–এর চিন্তা থেকেই 'মানব মুক্তি'র লক্ষ্য তুলে ধরেছেন। 'অর্থনীতির সূত্রগুলো ইচ্ছা নিরপেক্ষ' মার্কসের এই তত্ত্বটি সব সময় মনে রাখা হয়নি। বাজার –মুদ্রা ব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্রের পরিপন্থীরূপে বিবেচনা করা হয়েছে। অথচ সমাজতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়নি। ফলে বাজার–মুদ্রা ব্যবস্থার ইচ্ছা–নিরপেক্ষ প্রয়োজন কোনো আইনগত প্রাতিষ্ঠানিক পথ না পেয়ে নানা বিকৃতির জন্ম দিয়েছে। সামাজিক মালিকানাকে রাষ্ট্রীয় মালিকানার রূপের সাথে একাকার করে দেখা হয়েছে। শ্রেণী, রাষ্ট্র, পার্টি এসবের আন্তঃসম্পর্কের বিষয় মনে না রেখে সব একাকার করে ফেলা হয়েছে। প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে উৎপাদন সংগঠন কাঠামোর প্রয়োজনীয় নবায়ন সব সময় করা হয়নি। বিশেষতঃ সত্তরের দশকের প্রযুক্তিগত বিপ্লবের উল্লম্ফনকে গুরুত্বের সাথে আত্মস্থ করা হয় নি। জনগণকে বিষয় (object) এর অবস্থা থেকে ইতিহাসের বিষয়ীশক্তিতে (subbject) পরিণত করার ঐতিহাসিক কাজটির প্রতি চরম অবহেলা করা হয়েছে।

এসব ছিল গুরুতর ভ্রান্তি ও ত্রুটি। কিন্তু এসব ভ্রান্তি সত্ত্বেও সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ যে সফলতা অর্জন করতে পেরেছে তা সমাজতন্ত্রের শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বকেই প্রমাণ করে। ভ্রান্তি ও প্রয়োগে ত্রুটির ফলেই জমে উঠেছে নানা সমস্যা। এই জমে ওঠা সমস্যাগুলো 'সমাজতন্ত্রের' কারণে সৃষ্টি হয়নি "সমাজতন্ত্র থেকে পদস্খলনের'" কারণেই ঘটেছে।

এই অবস্থায় অতীতের এসব বিচ্যুতি সংশোধন, সমাজতন্ত্র সম্পর্ক কতকগুলো ভুল ধারণার অবসান এবং পরিবর্তিত বাস্তবতার সাথে সমাজতন্ত্রকে সময়োপযোগী করে তোলার কর্তব্যটি একটি বাস্তব প্রয়োজনরূপে দেখা দেয়। 'পেরেস্ত্রোইকা' বা

নবায়ন সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির জন্যই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কাজটি খুবই জটিল ও কঠিন ছিল। চীন একভাবে এই কাজটি শুরু করে। কয়েক বছর পরে গরবাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নে অন্যভাবে তার সূচনা করেন। কিন্তু পেরেস্ত্রোইকা'র পথে কৌশল ও বাস্তব পদক্ষেপ গুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি কতকগুলো গুরুতর ত্রুটি ও হিসেবের ভুল করেছেন। 'সমাজতন্ত্রের নবায়নের' ঘোষিত লক্ষ্য অতিক্রম করে ঘটনাবলী 'সমাজতন্ত্র পরিত্যাগের' ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হওয়ার পরিস্থিতি ক্রমে ঘনীভূত হতে থাকে। অত্যন্ত জটিল ও নাজুক এক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। সোভিয়েত সমাজে নানা বিপরীতমুখী শক্তির আবির্ভাব ঘটতে থাকে, যা ক্রমেই নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। সমস্ত ঘটনা প্রবাহকে পুঁজিবাদে প্রবর্তনের ধারায় পরিচালিত করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তৎপর হয়ে ওঠে। শেষোক্ত শক্তির প্রতি সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলরা মদত যোগাতে থাকে। নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে দুর্বল করার মাধ্যমে আমেরিকার একক কর্তৃত্বে তার আজ্ঞাবাহী এক 'নয়া বিশ্বব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠার জন্য তারা সুপরিকল্পিত অভিযান শুরু করে।

এরকম অবস্থায় একটি ক্ষুদ্রগোষ্ঠি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গরবাচেভকে অপসারণ করে। এই অভ্যুত্থান কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি দল হিসেবে এর সাথে জড়িত ছিল না। তবে পার্টি এই নাজুক পরিস্থিতিতে কোনো দৃঢ় অবস্থান নিতেও সক্ষম হয় নি। অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

কিন্তু তার পরেই শুরু হয়ে যায় আরেক ন্যাক্কারজনক ষড়যন্ত্র। পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তনকামী শক্তি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির জড়িত থাকার মিথ্যা অভিযোগ তুলে কমিউনিস্ট পার্টিকে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অখণ্ডতা ও তার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক সামাজিক বিধি ব্যবস্থাগুলোকে চুরমার করে দিতে আজ উদ্যত হয়েছে। পার্টির সব তৎপরতা স্থগিত করা হয়েছে, অফিস সীল করে দেয়া হয়েছে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কমিউনিস্ট বিরোধী উন্মাদনা উস্কে দেয়া হচ্ছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে। গরবাচেভের হাত থেকে ইয়ানয়েভ ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল অভ্যুত্থানের মাধ্যমে, আর তারপর ভিন্ন কায়দায় তার হাত থেকে ক্ষমতা ছিনতাই করা হয়েছে। গণতন্ত্র, সাংবিধানিকতা ইত্যাদি তাদের কাছে ফাঁকা বুলি মাত্র। পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা কায়েমের জন্যই তারা এসব নামাবলী গায়ে দিয়েছে মাত্র। বুর্জোয়া ভণ্ডামির অতি পুরোনো চরিত্রই তারা প্রদর্শন করছে।

১৯৮৫ সালে পেরেস্ত্রোইকা সূচনা করার সময় এবং পরবর্তীতে একাধিক্রমে গরবাচেভ একথাই বলেছিলেন যে, পেরেস্ত্রোইকা করা হচ্ছে সমাজতন্ত্রকে নবায়ন করে তাকে আরো শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে, সোভিয়েতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো মজবুত করার জন্যে। কিন্তু ঘটনাবলী এখন বিপরীত ধারায় প্রবাহমান। গরবাচেভ তার কথা রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিপর্যয়ের জন্য গরবাচেভ তার দায় এড়াতে পারেন না।

‘কমিউনিজম শেষ’ বলে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার উগ্র প্রচারণা সর্বত্রই যথেচ্ছ বিভ্রান্তির জন্ম দিচ্ছে। দু’দিন আগেও সমাজতন্ত্রের অনুসারী ছিলেন এমন অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। সমাজতন্ত্র–সাম্যবাদ–মার্কসবাদকে পরিত্যাগের কথা বলতে শুরু করেছেন। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণার কাছে তারা আত্মসমর্পণ করে রাতারাতি অকমিউনিস্ট বনে গেছেন।

আমার বিশ্বাস সাম্যবাদের পথে নব অভ্যুদয় ঘটবে। সামনে আলোর নিশানা। সোভিয়েতে সমাজতন্ত্রের বড় রকম বিপর্যয় এসেছে, একথা ঠিক। কিন্তু এই বিপর্যয় যে সাময়িক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে তার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নবায়িত ও পুনর্জাগরিত শক্তিতে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে মানব মুক্তির পথে সভ্যতার অগ্রযাত্রা, কমিউনিজমের বিজয় অভিযান।

বাহাত্তর দিনের পরে সত্তর বছর

আনু মুহাম্মদ

মানুষ তার নিজের ইতিহাস নিজে তৈরী করে,
কিন্তু ইচ্ছামতো তৈরী করতে পারে না।
–কার্ল মার্কস

অখণ্ড বিশ্ব প্রতিষ্ঠার 'মহান ব্রত' নিয়ে মিখাইল গরবাচেভের যাত্রা শুরু হয়েছিল। অখন্ড বিশ্ব প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক অখন্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের খন্ড খন্ড ভাগে বিভক্তি এবং পরিশেষে বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে তাঁর যাত্রা শেষ হয়েছে।

"ঐতিহাসিক ভূমিকা" পালন শেষে গরবাচেভের বিদায় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি বিশ্বব্যাপী তেমন কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি– উল্লাস কিংবা বিক্ষোভ কোনটাই তেমন জোরদারভাবে দেখা যায়নি। কেননা, এ দু'টো ঘটনার অনিবার্যতা সকলের কাছে আরও আগেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

একটি রাষ্ট্র এবং পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি কয়েকদিন আগে ঘটলেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে তার চরিত্র ও অবস্থান অনেক আগে থেকেই ক্রমান্বয়ে খর্ব হওয়া শুরু হয়েছে। ভেতরে ভেতরে অসঙ্গতি ও স্তরের আধিপত্য এ রাষ্ট্রকে একটি খোলসে পরিণত করে ফেলেছিল বেশ আগেই। গরবাচেভ সেই 'অসঙ্গতি ও ক্ষয়' থেকে উদ্ভুত শক্তিসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের বিলুপ্তির পৌরহিত্য করলেন মাত্র।

ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থাতেও ক্রুশ্চেভের 'বিখ্যাত' বক্তৃতা যে রকম প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেমনি গরবাচেভেরও প্রথম গ্রন্থ 'পেরেস্ত্রোয়কা'র ভাবনা প্রকাশিত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই ১৯৮৭ সালে। ওই গ্রন্থেই সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্রের অবশেষ দূর করা এবং রাষ্ট্র হিসেবে তার বিলুপ্তির লক্ষ্য বোঝা খুব কঠিন ছিল না। গরবাচেভের বক্তব্য অনুযায়ী 'মার্কিন প্রশাসকদের অনুরোধে' লিখিত এই গ্রন্থে মূল সুরটিই ছিল প্রতারণামূলক। মার্কস লেনিনের নাম যত্রতত্র ব্যবহার, তাদের নাম করে পেরেস্ত্রয়কা উপস্থাপন এবং অন্যদিকে মার্কিন তোষণ, জাতিগত ধর্মীয় উস্কানি সবই এ গ্রন্থে আছে। প্রতারণার এই উৎকৃষ্ট চর্চার কারণে বিশ্বব্যাপী প্রতারক সমাজতন্ত্রীদের কাছে এ বইটি 'মানবিক ও

গণতান্ত্রিক' সমাজতন্ত্রের দলিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মানবিক ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মুখ্য নায়ক এখন জর্জ বুশ। জারের আদর্শ আর পতাকা। এখান সেই গণতন্ত্রের প্রধান অবলম্বন।

গরবাচেভ ওই গ্রন্থেই বলেছিলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ আমরা স্বীকার করি, তাই পশ্চিমী শক্তির নেতৃত্বের জন্য বার্তা এই যে পেরেস্ত্রয়কায় আতঙ্ক নেই।" "বহুবার আমি ব্যাখ্যা করেছি যে পশ্চিমী স্বার্থবিরোধী কোনো লক্ষ্য আমরা অনুসরণ করি না। আমরা জানি যে, মার্কিন ও পশ্চিম ইউরোপীয় অর্থনীতির পক্ষে প্রধানত কাঁচামালের উৎস হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের এলাকা এবং এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকা কত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে ছেদ ঘটাবার কথা আমরা চিন্তাও করি না এবং ঐতিহাসিক কারণে সৃষ্ট পারস্পরিক অর্থনৈতিক স্বার্থের হানি ঘটাবার কোন অভিপ্রায় আমাদের নেই।" "আমি পুনরায় বলছি যে এই সব কিছুর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাভই হবে। কোন ক্ষতি হবে না।" "প্রাচীন রাশিয়া ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল খ্রিষ্ট ধর্মের মারফত। রাশিয়ার ইতিহাস মহা ইউরোপের ইতিহাসেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।" "ইউরোপ আমাদের অভিন্ন বাসভূমি।" "বিশ্বের রাজনীতিতেই হোক আর বিশ্বের ঘটনা-বিকাশের ক্ষেত্রেই হোক, বিশাল অভিজ্ঞতা আর সামর্থ্য-সম্ভাবনার অধিকারী ইউরোপের মান কেউই নিতে পারবে না।" সমর্থনদানের মধ্য দিয়ে অখণ্ড বিশ্বের ধারণা প্রচার, খ্রীষ্টিয় ধারাবাহিকতাকে মহিমান্বিত করবার মাধ্যমে মুসলিম প্রধান প্রজাতন্ত্রগুলোকে উস্কানি প্রদান, ইউরোপীয় অভিন্ন বাসভূমি গঠনের আওয়াজ তুলে এশীয় প্রজাতন্ত্রগুলোকে বিচ্ছেদের দিকে ঠেলে দেয়ার মধ্য দিয়ে ৮৭ সালেই গরবাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্জন ও বিপ্লব উত্তর ধারাবাহিকতাকে প্রবলভাবে আঘাত করা শুরু করেছেন, ৯১ সালে এটিই পরিপূর্ণ বিকশিত রূপ নিয়েছে।

তবে একথা বলা জরুরী যে, মিখাইল গরবাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভেঙেছেন, তিনি সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট ছিলেন কিংবা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়েছে এ ধরনের কথা অতি সরলীকরণ এবং বিপজ্জনকও বটে। গরবাচেভকে এতটা কৃতিত্ব দেয়া যায় না যে, তার ইচ্ছাতেই একটি বিশাল বিপ্লবের মাধ্যমে সংগঠিত দেশ ভেঙেচুরে যেতে পারে- সেই মহাদানবের শক্তি তার নেই। শক্তি নেই সাম্রাজ্যবাদেরও- সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে ৭০ বছরের বেশি সময় এটা টিকে থাকতে পারতো না।

মিখাইল গরবাচেভ সাম্রাজ্যবাদের আনুষ্ঠানিক এজেন্ট ছিলেন কি না আমরা জানি না, জানার খুব প্রয়োজনও নেই। তবে তিনি যা করেছেন একজন এজেন্ট ক্ষমতায় থাকলে তাই করতো। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি বোঝার ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই প্রশ্নটি যে ক্ষমতায় থেকে গরবাচেভ যা করেছেন তা কেন গৃহীত

হয়েছে সমগ্র পার্টি দ্বারা, প্রতিরোধ তো সৃষ্টি হয়নি–সমাজে সামাজিক শক্তিসমূহের মধ্যে সমালোচনার কিছু গুঞ্জন শোনা গেলেও উল্লেখযোগ্য কোন চাপও সৃষ্টি হয় নি। কেন এবং কিভাবে সমাজের মধ্যেই সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তির বিকাশ হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভেঙে পড়ার শর্তাবলী বিকশিত হয়েছে মনোযোগ সেদিকে কেন্দ্রীভূত করাটাই বেশি জরুরী। এজেন্ট থাকা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়, বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যেও এজেন্ট থাকে, বলশেভিক পার্টিতেও এজেন্ট ছিল–কিন্তু তারা সমগ্র বিশ্ব আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে পারেনি, বরঞ্চ তারাই সাংগঠনিক মতাদর্শিক শক্তির সবল ক্রিয়ায় উন্মোচিত হয়েছে।

মীর জাফর মীর সাদেকদের ভূমিকা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু তাদের কারণেই বাংলা–ভারত ইংরেজদের পদানত হয় নি। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিলো বলেই মীর জাফর সফল হয়েছিল। জাপানেও মীর জাফরেরা ছিল। কিন্তু সমাজের ক্ষমতা ও গতিশীলতার কারণে জাপান উপনিবেশ হয় নি।

২

সাধারণ প্রচারণার মধ্যে আছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে পিছিয়ে গেছে বলে পুঁজিবাদী বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়েছে– আর প্রযুক্তিগত বিকাশ হয় নি ব্যক্তিমালিকানা ও প্রতিযোগিতার অভাবে। সে কারণে বিভিন্ন দ্রব্যের মানও খুব খারাপ। একই সঙ্গে বলা হচ্ছে যে, যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের কারণে সোভিয়েত কৃষি বার বার মারাত্মক সমস্যায় পতিত হয়েছে। খাদ্য সংকট তুমুল আকার লাভ করেছে। সরবরাহ কমে গেছে। এসব সংকটের কারণেই জনগণ পুঁজিবাদের দিকে ঝুঁকেছেন। গরবাচেভ এসব সংকট সমাধানের জন্যেই খুলেছিলেন– পেরেস্ত্রয়কা ও গ্লাসনস্তের দোকান।

এ যুক্তিগুলোর বিশেষত্ব হচ্ছে, এগুলো প্রাথমিকভাবে খুবই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে–যথেষ্ট তথ্য সকলের সামনে না থাকায় হয়ে ওঠে অভ্রান্ত। এবং দ্বিতীয়তঃ আরো গুরুত্বপূর্ণ এসব যুক্তি থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে সবকিছুর মূল হচ্ছে উৎপাদন যন্ত্রের ওপর সামাজিক বা যৌথ মালিকানা। ব্যক্তিগত মালিকানা থাকলে এসব সমস্যা দেখা দিত না।

এসব যুক্তি উত্থাপন ও গ্রহণ করবার সময় পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের বাস্তব দিকগুলো সাধারণত ভুলে যাওয়া হয়। যৌথ বা সামাজিক মালিকানা চালু করা হয়েছে এরকম দেশের সংখ্যা খুবই কম, পুঁজিবাদী দেশের সংখ্যা পৃথিবীতে এখনও তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, জার্মানী নয়— স্পেন, পর্তুগাল, ভারত, বাংলাদেশ, কোরিয়া, উগাণ্ডা, চিলি ইত্যাদি শতাধিক দেশই প্রধানত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিচালিত। ব্যক্তিগত মালিকানা, বাজার অর্থনীতির খোলা দুয়ার দিয়েই এসব অর্থনীতি চলছে–এর সবগুলো দেশেই কি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত

বিকাশ সাধিত হচ্ছে? উৎপাদিত পণ্য উঁচু মান অর্জন করেছে? কৃষি শিল্প সমস্যার সমাধান হচ্ছে? ব্যক্তিমালিকানা থাকলে এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা থাকলে যদি এসব সমস্যার সমাধান হয় তাহলে গুটিকয়েক দেশ ছাড়া বাকি সব দেশেই কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি সবক্ষেত্রে এত পশ্চাৎপদ অবস্থা কেন?

তাছাড়া তথ্যগত দিক থেকেও ঠিকঠাকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পিছিয়ে ছিল একথা ঠিক নয়, যদিও এ তথ্য ঠিক যে, ভোগ্যপণ্যের মান সেখানে বর্তমান বিজ্ঞান প্রযুক্তির মানের তুলনায় অনেক নীচু। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনায়ক এবং ইতিহাসবিদ বুদ্ধিজীবী সকলেই জানেন সোভিয়েত ইউনিয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে পিছিয়ে ছিলনা, পিছিয়ে থাকলে সামরিক পরাশক্তি হিসেবে তার স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হত না। একটি পশ্চাৎপদ দেশ ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর যে দ্রুতগতিতে আধুনিক উন্নত একটি দেশে পরিণত হয় তার কোন দৃষ্টান্ত পুঁজিবাদী দেশের ইতিহাসে নেই–বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ সেখানে সমগ্র সমাজের শিক্ষিত ও বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠার সমান্তরালে ঘটেছিল। সত্তর দশক থেকে ভোগ্যপণ্যের কথিত নিম্ন মান, আরো সঠিকভাবে বললে বৈচিত্র্যহীন পরিবর্তনহীন–ভোগ্যপণ্যের আধিক্য বা বিরক্তিকর আধিপত্য সৃষ্টির কারণ কোন প্রযুক্তিগত সমস্যা নয়–বা অব্যক্তি মালিকানা ব্যবস্থাও নয়। এর কারণ আমলাতান্ত্রিক গতিহীন ব্যবস্থাপনা, চাহিদার বৈচিত্র্যের সঙ্গে তাল মেলানোর ব্যর্থতা।

খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রেও ঘটনা প্রায় একই রকম। খাদ্য উৎপাদনে সোভিয়েত ইউনিয়নে সংকট ছিল এটা ঠিক নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নে গড়পড়তা শর্করা ভোগ যে কোন পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশের তুলনায় কম নয়। পেরেস্ত্রয়কার সমর্থক আগানবেগানের হিসাব অনুযায়ী বার্ষিক মাথাপিছু মাংস ছিল ৮৫ কেজি, দুধ ৩৬০ কেজি এবং ফল ৪০ কেজি। চাহিদা ছিল বৈচিত্রময় ও উঁচুদরের প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের জন্য যার উৎপাদন প্রক্রিয়া সেভাবে কার্যকর ছিল না। খাদ্য উৎপাদনের মাথাপিছু হিসাব সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে, অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মত শুভংকরের ফাঁকি ছিল না। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মাথাপিছু উৎপাদন মানে ছিল আসলেই মাথাপিছু প্রাপ্যতা।

৩

যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার প্রতিষ্ঠার কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নে খাদ্যশস্য উৎপাদনে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল বলে যে প্রচার রয়েছে, বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন তথ্য থেকেই তা খণ্ডিত হয়। এসব তথ্যের সাহায্যে কে,ই গ্রিফিন নীচের ছকটি সাজিয়েছেন।

কৃষি উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার (বার্ষিক শতকরা)

ব্যক্তি মালিকানাধীন		যৌথ ও সামাজিক মালিকানাধীন	
কৃষি খাতের দেশ		কৃষি খাতের দেশ	
১৯৬০/৮০		সোভিয়েত ইউনিয়ন	১·৭
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১·১	পূর্ব জার্মানী	১·৭
পশ্চিম জার্মানী	১·৪	চেকোশ্লোভাকিয়া	২·৩
বেলজিয়াম	০·১	হাঙ্গেরী	৩·১
ফ্রান্স	১·১	বুলগেরিয়া	১·৪
নেদারল্যাণ্ড	৩·৪	রুমানিয়া	৩·৭
যুক্তরাজ্য	১·৯	আলবেনিয়া	২·৯
ইটালী	২·০	চীন	৪·৬
ভারত	১·৯	উত্তর কোরিয়া	৫·১
দক্ষিণ কোরিয়া	৩·৭	ভিয়েতনাম	৩·২
গড়পড়তা হার	১·৮৪	কিউবা	২·১
		গড়পড়তা হার	২·৮৯

এখানে রুমানিয়া ও হাঙ্গেরী ১৯৬০–'৮১; চীন ১৯৫০–'৮১ এবং কৃষিতে যৌথ মালিকানাধীন অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে ১৯৬৬–'৮১ সময়কাল ধরা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, যেসময়কালের হিসাব ধরা হয়েছে সে সময়কালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার আগের তুলনায় কমে এসেছে–আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, স্থবিরতাও দেখা গেছে অনেকখানি–বিশেষতঃ সত্তর দশক থেকে। এরপরও কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ব্যক্তিমালিকানাধীন অর্থনীতি থেকে কমে যায়নি।

আগানবেগানের বক্তব্য অনুযায়ী সোভিয়েত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হ্রাস গতিলাভ করেছে গত দ্'দশকে। "১৯৬৬–'৭০ সময়কালে জিএনপি প্রবৃদ্ধি হার ছিল শতকরা ৪১,'৭১–'৭৫ সময়ে তা ছিল শতকরা ২৮, '৭৬–'৮০ সালে ছিল ২১ এবং '৮১–'৮৫ সালে তা ছিল শতকরা ১৬৫। '৮৫–র পর পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে।" তার তথ্য অনুয়ায়ী ৬০ দশক পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ছিল সর্বোত্তম। আয়ুসীমা ৭১ অতিক্রম করেছিল। শিক্ষাখাতে জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ভাগ ব্যয় করা হত। আশ্রয়, যোগাযোগ ও বিনোদন ছিল সকলের জন্য নিশ্চিত। কর্মসংস্থান তো বটেই।

৪.

তাহলে সমস্যাটা কোন্ জায়গায় হল? গরবাচেভ এবং পেরেস্ত্রয়কা সমর্থক বিশেষজ্ঞরা সমস্যা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন, ৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে

সোভিয়েত অর্থনীতিতে একটানা স্থবিরতা সৃষ্টি হয়, প্রবৃদ্ধিতে হ্রাস দেখা যায়– আমলাতান্ত্রিকতা সমাজের সর্বস্তরে ভয়াবহ অচলাবস্থা তৈরী করে। এগুলো না ভাঙতে পারলে আর অগ্রসর হওয়া যাবে না। এ কথাগুলো সত্য কিন্তু কেন এই স্থবিরতা ও আমলাতান্ত্রিকতার বিকাশ ঘটলো, সোভিয়েত সমাজে–এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

অর্থনীতি ক্ষেত্রে স্থবিরতার কারণ হিসেবে দুইটি দিককে প্রচারে আনা হয় ঃ প্রথমতঃ ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি, দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনা। অর্থনৈতিক স্থবিরতার কারণ হিসেবে এ দুটোকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ হাজির করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অপরিকল্পিত ও ব্যক্তি মালিকানাধীন অর্থনীতিকে বিপ্লব উত্তর পরিকল্পিত ও অব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবস্থায় যে পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে তা সকলেই জানেন। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার যা ছিল তার তুলনায় অনেকগুণ বেশি প্রবৃদ্ধির হার ছিল পরিকল্পিত ব্যবস্থাধীনে।

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বাস্তবায়ন, যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার প্রতিষ্ঠা, ব্যাপক শিল্পায়ন সোভিয়েত জনগণকে বর্বর অন্ধকার জগত থেকে যে আধুনিক সমাজে তুলে এনেছে সে বাস্তবতা গরবাচেভের পক্ষেও অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। বরঞ্চ তিনি উচ্চকণ্ঠেই তা স্বীকার করেছেন। তার চিকন প্রতারণা এখানেও ছিল, তিনি এই অর্জনগুলোকে উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করলেও এসব সাফল্যের সামাজিক, রাজনৈতিক দিক ও শর্তাবলী মুখেও আনেননি এবং তিনি একই গ্রন্থে রাজনীতিমুক্ত পরিবর্তনের কথা বলে সব অর্জনকে বাতিল করার কর্মসূচী হাজির করেছেন।

পরিকল্পিত অর্থনীতি ও যৌথ মালিকানা ৭০ দশকের প্রথম পর্যন্ত যে বিকাশ সম্ভব করলো, ৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে তা কার্যত আর সম্ভব হলো না কেন? এখানে তাহলে অন্য কি কারণ থাকতে পারে? বলা যেতে পারে আমলাতান্ত্রিকতার কথা। কিন্তু এই আমলাতিন্ত্রকতা হঠাৎ করে তখন সৃষ্টি হলো কেন? অনেকের মত অনুযায়ী এটা যদিও লেনিন–স্ট্যালিন আমল থেকে থাকে তাহলে তখন আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে গতিশীলতা সৃষ্টি করা সম্ভব হল–৭০ দশকের পরে আর সম্ভব হল না কেন? সমাজতন্ত্র এক আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল সেখান থেকে স্থবিরতার সৃষ্টি হয়েছে এবং সমাধান হচ্ছে ব্যক্তি মালিকানা, প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠা– দীর্ঘ সময়কালেও বিশ্ব প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে এ সকল যুক্তি বিন্যাস কোনভাবেই প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না। তা হলে এখানে অন্যান্য কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

৫.

বিশ্বের যে কয়টি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণের চেষ্টা নেয়া হয়েছে তার সবগুলোই ছিল পশ্চাৎপদ সমাজ, তুলনামূলকভাবে দুর্বল পুঁজিবাদী দেশ অর্থাৎ প্রাক পুঁজিবাদী নানা উপাদান, পিছুটান সেখানে ছিল। এ অবস্থা থেকে সমাজকে তুলে আনবার জন্য অনেক কাজ এসব সমাজে সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক শক্তিকে করতে

হয়েছে। যেগুলো পুঁজিবাদের শেষ করবার কথা, সেগুলির বাড়তি দায়িত্ব নিতে হয়েছে। অভিজ্ঞতাহীন অবস্থায় পুরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে, ভুল হয়েছে ক্ষতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সাফল্য এসেছে তার চাইতে বেশী। সমাজতন্ত্রের সাফল্য মানে শুধু উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নয়-মানে শুধু জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ নয়- সমাজতন্ত্রের সাফল্য এর চাইতে আরো অনেক বড়। মানুষকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। মানুষ যে সৃষ্টিশীল একটি জীব- সে যে একটি সক্রিয় সচেতন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি-মানুষের জীবন যে অর্থলোলুপতা, হিংস্র প্রতিযোগিতা ও ব্যক্তি স্বার্থপরতার উর্ধ্বে যেতে পারে তা প্রতিষ্ঠা করা। মানুষকে তারই সৃষ্ট মৃত শ্রমের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের শারীরিক মানসিক মুক্তি বিধানের এবং একটি শৈল্পিক সমাজ নির্মাণের বস্তুগত ও মতাদর্শিক শর্তাবলী পূরণের লক্ষ্যেই সমাজতন্ত্রকে কাজ করতে হয়। সে জন্য সমাজতন্ত্রের আগের যে কোন ব্যবস্থার তুলনায় মানুষের সচেতন ভূমিকার গুরুত্ব থাকে অনেক বেশী। সচেতন ভূমিকা-সচেতন কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। এই সচেতনতা লক্ষ্য সম্পর্কে, পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে; আশু লাভ দূরবর্তী ক্ষতি, আশু ক্ষতি দীর্ঘমেয়াদী লাভ, ব্যক্তির লাভ সমাজের ক্ষতি, সমাজের লাভ ব্যক্তির ক্ষতি, ব্যক্তির বিকাশ ও সমাজের বিকাশ, বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক দুইতর সমন্বিত বিকাশ ইত্যাদি সকল বিষয়ে সচেতনভাবে অগ্রসর হবার প্রশ্নটা এখানে জড়িত। কিন্তু এই সচেতন ভূমিকা বিষয়ীগত ব্যাপার। এই সচেতন ভূমিকা আবার বিষয়গত অর্থাৎ বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভরশীল। বাস্তব পরিস্থিতি থেকে উর্ধ্বে উঠে সমাজের ইচ্ছামত রূপান্তর ঘটানো যায় না।

সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তার অনুসন্ধান তাই এই বস্তুগত পরিমণ্ডল এবং চেতনা এই দু'ক্ষেত্রেই অনুসন্ধান।

এটা ঠিক যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এ বিশ্বের মানুষকে যে মানবিক ও আধুনিক জীবনের সন্ধান দিয়েছে সে জীবন অন্য কোন ব্যবস্থার পক্ষেই দেয়া সম্ভব নয়- এ ব্যবস্থা মানুষকে অনেক অর্জন, স্বপ্ন, ভালবাসার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু এ সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত যে শক্তি ও ক্ষমতা আছে তার খুব কমই এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। যতটা উন্নত মানবিক সমাজ নির্মিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণের প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্র তার থেকে অনেক উন্নত, অনেক বেশী গণতান্ত্রিক জীবন নিশ্চিত করবার ক্ষমতা ধারণ করে। কিন্তু সে ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ এখনো আমরা দেখিনি। যে বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে, যে বস্তুগত পরিমণ্ডলে এখনও সমাজতন্ত্র অবস্থান করছে, এই না দেখতে পারার কারণ অনুসন্ধানে তাকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

৬.

সমাজতান্ত্রিক একটি ব্যবস্থা যে সর্বহারার একনায়কত্ব ছাড়া, তার বিরুদ্ধ শক্তির উপর কর্তৃত্ব বিস্তার ছাড়া সাম্যবাদের দিকে যেতে পারবে না- এ সূত্রায়ন বিপ্লবের

আগেই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সর্বহারার একনায়কত্ব প্রয়োগের জন্য তার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা কি হবে এটা কোনো পূর্বনির্ধারিত বিষয় ছিল না। সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়নের জন্য একদলীয় ব্যবস্থা প্রয়োজন এটাও এ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লবের ৪ বছর পর এক দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, গুপ্তচর সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। হয় এমন এক পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে যেখানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রক্ষার আর বিকল্প ছিল না– চারদিকের একটানা আক্রমণ, চক্রান্ত, অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ মোকাবিলার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র এই চরিত্র নিয়েছে। এতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রক্ষিত হয়েছে, শত্রুরা পর্যুদস্ত হয়েছে কিন্তু অনেক সমস্যাও সৃষ্টি হয়েছে। আবার ২০ দশকে দুর্বল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল তাতে 'কুলাক' 'আমলা'রা আবার হাস্যোজ্জ্বল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তাদের সঙ্গে যোগসাজশ স্থাপিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের। তাদের দমন করতে হয়েছে। এই দমন প্রক্রিয়ার কোন বিকল্প ছিল না। কিন্তু তা দমনমূলক ব্যবস্থার চাহিদা তৈরী করেছে।

যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হয় তখন তার সাফল্যের অন্যতম শর্ত ধরা হয়েছিল যে, সামরিক খাতে ব্যয় আর বৃদ্ধি পাবে না। কিন্তু এই শর্ত রক্ষা করা যায়নি। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর যুদ্ধসজ্জা, ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ইত্যাদি মোকাবিলার জন্য বারবার সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করতে হয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সমরাস্ত্র উৎপাদনে বিপুল বিনিয়োগ, এ খাতে বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদসহ সমাজের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মেধা নিয়োগ তার অন্তর্নিহিত তাগিদেই করতে হয়। এর কারণ প্রধানতঃ দুটো– প্রথমতঃ মুনাফার জন্য উৎপাদন এ খাতটির মুনাফাযোগ্যতা বেশী এবং দ্বিতীয়তঃ পুঁজিবাদ কখনোই নিজ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, নিপীড়িত জাতি ও অন্যান্য দুর্বল দেশের ওপর দমন পীড়ন ও আধিপত্য ছাড়া টিকতে পারে না। কিন্তু যেহেতু অন্তর্নিহিতভাবে সমাজতন্ত্রের মধ্যে এ দুটি শর্তই অনুপস্থিত সেহেতু সমরাস্ত্র উৎপাদন সমাজতন্ত্রের জন্য উপযোগী তো নয়ই বরঞ্চ তার চরিত্রের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকার কারণে, তার হুমকি–আক্রমণ মোকাবিলার জন্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও এ খাতে বিপুল বিনিয়োগ করতে হয়েছে। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমরাস্ত্র উৎপাদন বিনিয়োগ বেড়েছে, প্রতিক্রিয়া হিসেবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও এর বিনিয়োগ বেড়েছে। পুঁজিবাদ সমরাস্ত্র উৎপাদনের মধ্য দিয়ে মুনাফার সন্ধান করেছে। তা দিয়ে নিজের আগ্রাসী ভূমিকা বাস্তবায়ন করেছে, দেশে দেশে সামরিক বাহিনীর বিকাশ সে দেশটাকে অবরুদ্ধ করেছে–কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ ব্যয় বৃদ্ধি সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য বাস্তবায়নকে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বিপুল সম্পদ এ খাতে অপচয় হয়েছে, এর সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে বিজ্ঞান প্রযুক্তি গবেষণার বিরাট অংশ এ দিকে নিয়োজিত হয়েছে, গড়ে উঠেছে বিশাল সামরিক

শক্তি– পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার পাল্টা গোয়েন্দা সংস্থা। এ সব অপচয়মূলক ব্যয় ও দমনমূলক প্রতিষ্ঠান শত্রুর জন্য হুমকির সৃষ্টি করেছে কিন্তু জনগণের উপরও নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দানবীয় ফ্যাসিবাদী আক্রমণকে সফলভাবে মোকাবিলার মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নে সামরিক খাতে বিপুল ব্যয় একটা যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রবল, অপরাজেয় ও দায়িত্বশীল শক্তি হিসেবে পরিচিত হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রক্ষা পেয়েছে– বিশ্বব্যাপী আরও অনেক দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী শক্তির বিজয়ের প্রবল সমর্থক হিসেবে সোভিয়েত রাষ্ট্র বিশ্বের জনগণের সামনে ভরসার স্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে, আত্মসন্তুষ্টিতে ভরপুর পার্টি কর্মীদের অন্ধ হতে থাকা দৃষ্টির আড়ালে ক্রমশ বেড়ে উঠেছে স্বাধীনভাবে আরেকটি শক্তি– যার সবকিছু গোপন– যা পরিচালিত হয় আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে–সেটি হল স্থায়ী সামরিক বাহিনী।

এই সামরিক বাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতার রদবদলে সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চভের ক্ষমতা দখল করতে ৩ বছর সময় লেগেছে, ক্ষমতা সংহত করতে লেগেছে ৭ বছর– ক্রুশ্চভের পক্ষে সামরিক বাহিনীর অবস্থান নিশ্চিত হবার পরই ক্রুশ্চভ ক্ষমতায় যেতে পেরেছেন, অবস্থান দুর্বল হবার পর উচ্ছেদ হয়েছেন। গরবাচেভের আগমন ও প্রস্থান, পূর্ব ইউরোপের পরিবর্তনেও এই বাহিনীর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক ক্ষমতায় জনগণের অংশগ্রহণ, শ্রমিক কৃষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ধারণ যত সংকুচিত হয়েছে বেসামরিক আমলাদের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক আমলাদের ক্ষমতা তত বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রুশ্চভ ক্ষমতায় এসে বলেছিলেন, ২০ বছরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্যবাদে প্রবেশ করবে। কথাটা এখন খুব মুর্খের মতো শোনালেও তখন ক্রুশ্চভ এ কথাটা বলার জোর পেয়েছিলেন সোভিয়েত সমাজ ও অর্থনৈতিক বিশাল সমৃদ্ধির উপর দাঁড়িয়েই।

৭.

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে উৎপাদিকা শক্তির বিপুল বিকাশ সোভিয়েত সমাজকে সমৃদ্ধ করেছিল আবার রাষ্ট্রীয় সীমানার সীমাবদ্ধতার কারণে তা সমস্যাও সৃষ্টি করেছিল। পুঁজিবাদী উন্নত দেশগুলো তার প্রয়োজনীয় পুঁজি পুঞ্জিভবনে এবং মেধা সংগ্রহে তার অধীনস্থ সমগ্র বিশ্বকে ব্যবহার করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না– তাকে অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও মেধার উপর প্রায় পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়েছে। কিন্তু এরপরও প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে যে, অন্যান্য দেশের উপর লুণ্ঠন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণেই একটি দেশ অনেক দ্রুত

গতিতে সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম। কিন্তু সমস্যা হল এরপর। পুঁজিবাদী দেশে বিনিয়োগ ও উৎপাদন মুনাফার সন্ধানে তার রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করে। বিনিয়োগ ক্ষেত্র ও বাজার তার বিশ্বব্যাপী। বিশ্বব্যাপী মুনাফা সরবরাহের জন্য পুঁজিবাদ কোন নৈতিকতার ধার ধারে না, যে কোন বর্বরতার পথে সে যেতে রাজী থাকে। পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মুনাফার হার তার গড় মুনাফার হার ঠিক রাখতে সাহায্য করে। বিশ্বব্যাপী এই আধিপত্য তার উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার শর্ত পূরণ করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার উদ্বৃত্ত উৎপাদন বিক্রির জন্য এভাবে বিশ্ববাজার দখল করতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল প্রবৃদ্ধি বিপুল উদ্বৃত্তেরও সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বের বহুদেশে সেগুলোর বাস্তব চাহিদা থাকলেও বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের কারণে তা সম্ভব হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের অধীনে বাজার সৃষ্টি ও বাজার রক্ষা নিছক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে হয় না। হয় নানা রকম বল প্রয়োগ, চাপ ইত্যাদির মাধ্যমে। প্রয়োজনে রক্তাক্ত পরিবর্তন হয়, সামরিক শাসন আসে, শাসক নিহত হন তবুও বাজার রক্ষা করতে হয়। উদ্বৃত্ত উৎপাদন বাজারজাতকরণের সমস্যা তাই পুঁজিবাদী বিশ্ব দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে মোকাবিলা করতেই হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে পথ নির্ধারণ করলেন ক্রুশ্চেভ তা হল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতাকে সম্প্রসারিত করা, অনুন্নত দেশগুলোতে বিপ্লব হোক বা না হোক সেখানে নিজের মিত্র বের করা। ক্রমান্বয়ে তৈরী হল শান্তিপূর্ণ পথে বিপ্লবের তত্ত্ব, অধনবাদী বিকাশের তত্ত্ব। ব্রেজনেভ আমলে পূর্ব ইউরোপকে 'সীমাবদ্ধ সার্বভৌমত্বের" বেড়াজালে আটকানো হল। অনুন্নত দেশগুলোতেও পেটি বুর্জোয়া ফ্যাসিবাদকে উৎসাহিত করা হল। কিন্তু এ সব সমাধান বরঞ্চ সমস্যাকে আরও জটিল করলো। রাষ্ট্রীয় স্বার্থ হয়ে উঠলো প্রধান, জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্তার ঘটলো। আন্তর্জাতিক দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থের অধীনস্থ হল। বাইরের এসব ঘটনার ঘরের দিকও উল্লেখযোগ্য। আমলতান্ত্রিকতা ও ম্যানেজারদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই–এর জন্য উৎপাদকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা আগে ব্যবহৃত হতো। বিভিন্ন পার্টি কমিটি, গণসংগঠন, সামাজিক সংগঠনগুলো একাজে নিয়োজিত ছিল। ক্রুশ্চেভের সময়ে সর্বহারা একনায়কত্ব বাতিল এবং আমলাদের পার্টি সদস্যপদ প্রাপ্তির ব্যাপারে সতর্কতা দূর করায় ৬০ দশকেই পার্টিতে উৎপাদকের স্থানে আধিপত্য সৃষ্টি হল আমলাদের। শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে আমলাদের প্রাধান্য আনা হয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় উৎপাদকের অংশগ্রহণকে খর্ব করা হয়। ব্রেজনেভের আমলে এ অবস্থা আরও সংহত হয়।

পুঁজিবাদী বিশ্বের ন্যাটো প্রতিষ্ঠার বিপরীতে ওয়ারশ প্রতিষ্ঠা যতটা সমাজতান্ত্রিক নিরাপত্তা বিধান করলো তার চাইতে বেশীমাত্রায় খর্ব করলো পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর অধিকার।

৬০ দশকের এই বিকাশ ধারা ৭০ দশকে পূর্ণ রূপ পায় এবং বিশাল আমলতান্ত্রিক যন্ত্রের মধ্যে চাপা পড়ে বিপ্লব–উত্তর সমাজের যাবতীয় সৃজনশীলতা, সচেতন ভূমিকা আর স্বতঃস্ফূর্ততা। রাষ্ট্রের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে উৎপাদকের। উৎপাদকরা আমলাদের কর্মচারীতে পরিণত হন। মতাদর্শিক সংগ্রাম হয়ে দাঁড়ায় পরিত্যাজ্য। মুখস্থ বুলি, রাষ্ট্র নির্দেশিত বাণী প্রচারের আধিপত্য সমাজকে ক্রমান্বয়ে রাজনীতি–রাষ্ট্র সম্পর্কে অনীহ করে তোলে। 'খালি মাথা' প্রজন্মের বিকাশ হতে থাকে। সর্বক্ষেত্রে আমলাদের নিয়ন্ত্রণের ফলে সৃষ্টি হয় 'কার্যতঃ মালিক' একটি শ্রেণী যারা সম্পদের বড় ভাগীদারে পরিণত হয়। ব্যক্তিগত বিনিয়োগের সুবিধা না থাকায় ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য ক্রমশঃ প্রকট হতে থাকে। দুর্নীতি, কালোবাজারীর বিস্তার ঘটতে থাকে। 'কার্যতঃ মালিক' আমলাশ্রেণীর মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে বুর্জোয়া শ্রেণী। একটি বড় অসঙ্গতির সৃষ্টি হয় সমাজে। এমন একটি শ্রেণী বিকশিত হতে থাকে সমাজে যাদের হাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ জমছে, কিন্তু সমাজের বিদ্যমান আইন–কানুন অনুযায়ী যার বিনিয়োগের স্বাধীনতা নেই– স্বাধীনতা নেই বেহিসেবী ভোগের।

একদিকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অনীহ, বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চারধারে বেড়ে উঠেছে সম্পদ আত্মসাৎকারী নব্য বুর্জোয়া শ্রেণী। সর্বহারা শ্রেণীর দীর্ঘ পথযাত্রার প্রধান হাতিয়ার মতাদর্শিক সংগ্রামের অনুপস্থিতিতে এবং আমলাদের আধিপত্যে পার্টি হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ আমলতান্ত্রিক পার্টি এবং আমলাতান্ত্রিকতার জগদ্দল পাথরে। সৃষ্টিশীল চিন্তার বিকাশ হয়ে পড়েছে অবরুদ্ধ। পার্টি কাঠামোর কারণে ভিন্ন চিন্তার বিকাশও হয়ে পড়েছে অসম্ভব।

এ কারণে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের পক্ষে কোন রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ সম্ভব হয়নি, বিকশিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চারধারে সমবেত নব্য বুর্জোয়া শ্রেণীর শক্তি। যে শ্রেণীর প্রয়োজন বিনিয়োগের অধিকার, যাদের প্রয়োজন ব্যক্তি মালিকানার অধিকার, যাদের প্রয়োজন বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে স্বাধীন যোগসাজশের অধিকার।

এই শ্রেণীর এই অধিকার পূরণ এবং এই শ্রেণীর অস্তিত্বের সঙ্গে সোভিয়েত সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও আইন–কানুনের যে দ্বন্দ্ব ক্রমেই বিকশিত হয়েছে তারই নিরসন প্রক্রিয়া আমরা গত ৫ বছরে লক্ষ্য করেছি। এই শ্রেণীর প্রাথমিক প্রতিনিধি ছিলেন গরবাচেভ– তাঁর পেরেস্ত্রয়কা ছিল বস্তুতঃ এই শ্রেণীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব। কিন্তু পেরেস্ত্রয়কা গ্লাস্তনস্ত যথেষ্ট ছিল না, তবে তা পুরনো ব্যবস্থাকে ভেঙে দেয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল। গরবাচেভ এদের প্রতিনিধি ছিলেন বলেই– আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন কিন্তু আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে যারা কোটিপতি হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেননি বরঞ্চ কালো টাকা সাদা করে তা বিনিয়োগ করবার অধিকার দিয়েছেন। গণতন্ত্রের কথা বলেছেন, কিন্তু ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঠামোকে অচলাবস্থার মুখে নিক্ষেপ করবার

যাবতীয় ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করেছেন। গরবাচেভের ঐতিহাসিক ভূমিকা শেষ হবার পর এই শ্রেণী তাকে পরিত্যাগ করেছে– এই শ্রেণী এবং তাদের সহযোগী সামরিক বাহিনী আরও প্রতিনিধিত্বশীল ইয়েলৎসিনকে সামনে নিয়ে এসেছে। এই শ্রেণীর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করবার যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক, আইনগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাধা দূর করবার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি এবং জারের পতাকা ও আদর্শকে মহিমান্বিত করে রাশিয়ার উদ্ভব এরই এই পর্যায়ের শেষ ঘটনা।

যে প্রক্রিয়াটি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করলাম তা আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দাবী রাখে। তবে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেও যে দিকটা উঠে আসে সেটি হল সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার সমস্যার সঙ্গে বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদের আধিপত্যের বাস্তবতার সম্পর্কটি গুরুত্বপূর্ণ। চেতনাগত ও মতাদর্শিক যে অধঃপতন এসব দেশে ঘটেছে তা এ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেই বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, পুঁজিবাদী বিশ্বের আধিপত্যের মধ্যে একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণ একেবারেই অসম্ভব কিংবা অর্থহীন। অসম্ভব বা অর্থহীন যে নয় এটা বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নেও প্রমাণিত হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষমতা ও শক্তির আংশিক প্রয়োগেও মানুষ কতটা উন্নত জীবনের স্বাদ পেতে পারেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হলেও মানুষের এই স্বাদ, এই অভিজ্ঞতা বিলুপ্ত হয়নি। হয়নি বলেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন সত্ত্বেও এই অঞ্চলের জনগণকে পুঁজিবাদের খোয়াড়ের আগের মত ঢোকানো সম্ভব হবে না; হয়নি বলেই বিশ্বব্যাপী মানুষের মুক্তির সংগ্রামে ঐ অভিজ্ঞতা অসীম প্রেরণা হিসেবে ঠিকই কাজ করবে।

১৮৭১ সালে প্যারী কমিউন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মুখে প্রথমে মার্কস এ ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন এই বলে যে, এর টিকে থাকার বাস্তবতা নেই। কিন্তু যখন শ্রমিকরা বিশ্বের এই প্রথম সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তখন মার্কস এর পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। বাস্তবতা ছিল না বলে এটি মাত্র ৭২ দিন টিকেছিল, রক্তাক্ত হয়েছিল প্যারিস। লেনিনের ভাষায়, 'প্যারিস হারিয়েছিল তার প্রায় ১ লাখ শ্রেষ্ঠ মানুষকে'; তুলনামূলকভাবে দুর্বল শ্রমিক শ্রেণী তখন পরাজিত হয়েছিলেন কিন্তু এই প্যারী কমিউন রেখে গিয়েছিল অসাধারণ এক অভিজ্ঞতার সম্পদ এবং প্রেরণা। শোষক শ্রেণী উল্লসিত হয়েছিল এই বলে 'সব শেষ করে ফেলেছি'। প্যারী কমিউন ভেঙে গিয়েছিল, সংগ্রামী শ্রমিকরা উচ্ছেদ হয়েছিলেন– কিন্তু তাদের স্বপ্ন বিশ্বব্যাপী বহুগুণে বর্ধিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। মার্কস তা থেকে শিক্ষিত হয়েছেন, শিক্ষিত হয়েছেন বিশ্বব্যাপী মুক্তি সংগ্রামী মানুষেরা। মাত্র ৪৬ বছর পরেই আরও শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে– সোভিয়েত ইউনিয়ন।

প্যারি কমিউন টিকেছে ৭২ দিন, কিন্তু তার অভিজ্ঞতা দ্বারা সমৃদ্ধ এবং বাস্তবতার বিকাশ যে দ্বিতীয় সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন

অন্ততঃ রাষ্ট্র হিসেবে টিকলো প্রায় ৭০ বছর। কয়েকশো গুণ বেশিদিন টিকে থাকার সাফল্য এবং তার আরও টিকে থাকতে না পারার ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমৃদ্ধ করেছে সমগ্র মানবজাতিকে। প্যারী কমিউনের মত সোভিয়েত ইউনিয়নও এখন ইতিহাস, একইভাবে তাও আরও অনেক বেশী জীবন্ত এবং বিশাল প্রেরণা ও শিক্ষার উৎস।

৮.

পুঁজিবাদ সামন্তবাদকে উচ্ছেদ করে ঠাঁই করে নিতে অনেক বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে। আগের যে কোন ব্যবস্থার চাইতে অনেক বেশী গতিশীল ও বিপ্লবী হওয়া সত্ত্বেও পুঁজিবাদ তার অগ্রযাত্রায় অনেকবার সামন্তবাদের কাছে পরাজিত হয়েছে। কয়েকশো বছর লেগেছে তার বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে। অনেক বেশী গতিশীল ও বিপ্লবী হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। ঠিক একইভাবে পুঁজিবাদের তুলনায় অনেক বেশী গতিশীল ও বিপ্লবী হওয়া সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রকে বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে আরও বহু বিপ্লব পার হতে হবে। আর এই বহু বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় তাকে জন্ম দিতে হবে প্যারি কমিউন, সোভিয়েত ইউনিয়নের মত অনেক অভিজ্ঞতার, দিনে দিনে তার শক্তি বাড়বে– যেমন বেড়েছে প্যারী কমিউন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে। দিনে দিনে সমাজতন্ত্র আরও শক্তিশালী আরও দক্ষ, যোগ্য ও বিকশিতরূপে উদ্ভূত হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের চাইতে ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতা হবে আরও সমৃদ্ধ, আরও শক্তিশালী এবং এভাবে দেশে দেশে বিপ্লবের সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র একটি বিশ্বব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবার পরই তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও ক্ষমতার পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটা সম্ভব হবে। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আধিপত্য চুরমার হবার পর এক দলের শাসনব্যবস্থা, কঠোর নিয়ন্ত্রণ, সামরিক খাতে ব্যয়, স্থায়ী সামরিক বাহিনীর বিকাশ, জনগণের দেশ থেকে দেশে ভ্রমণে বাধা, সৃজনশীলতার পথে নানা প্রতিবন্ধকতা, ক্ষমতা ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জনগণের প্রাণবন্ত অবিচ্ছিন্নতার বিরোধ অবস্থা, গণতান্ত্রিক অধিকারের আরও অনেক বেশী সম্প্রসারণের নানা সীমাবদ্ধতা, আমলাতান্ত্রিকতা ইত্যাদির বস্তুগত শর্তগুলোও আর বেড়ে উঠতে পারবে না। দেশে দেশে সর্বহারা শ্রেণীর সচেতন সংগঠিত সংগ্রামের বিকাশ কতটা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হবে তার ওপরই নির্ভর করবে এর জন্য আমাদের অপেক্ষাকালের দৈর্ঘ্য।